কাঙ্গালের ঠাকুর

শ্রীজলধর সেন

ভাদ্র ১৩২৭।

মূল্য আট আনা
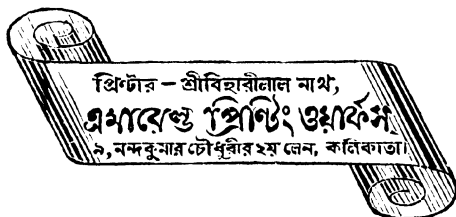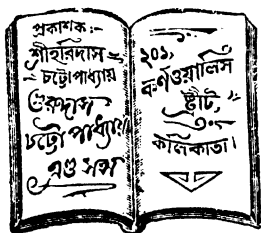
ভারতেতিহাসের একনিষ্ঠ উপাসক,

সোদরাধিক স্নেহভাজন

শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

করকমলে

শ্রীযুক্ত জলধর সেনের পুস্তকাবলী

১। প্রবাসচিত্র (তৃতীয় সংস্করণ) ... ... ১৲
২। হরিশ ভাণ্ডারী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ... ॥০
। নৈবেদ্য (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ... ॥০
৪। কাঙ্গাল হরিনাথ (প্রথম খণ্ড) ... ১।০
। কাঙ্গাল হরিনাথ (দ্বিতীয় খণ্ড) ...
৬। করিম সেখ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ...
৭। ছোট কাকী (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ...
৮। নূতন গিন্নী (তৃতীয় সংস্করণ) ৸০
৯। বিশুদাদা ঐ ... ... ১।০
। পুরাতন পঞ্জিকা ... ... ১৲
। পথিক (তৃতীয় সংস্করণ) ... ... ১৲
২। সীতাদেবী (চতুর্থ সংস্করণ) ... ... ১৲
৩। আমার বর (তৃতীয় সংস্করণ) ... ... ১।০
। পরাণ মণ্ডল ... ... ১।০
। হিমাদ্রি ৸০
৬। কিশোর (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ... ১৲
। অভাগী (পঞ্চম সংস্করণ) ... ... ॥০
। আশীর্ব্বাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ... ... ১।০
দশদিন ... ... ১।০

কাঙ্গালের ঠাকুর

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময়ে একজন জগন্নাথদেবের পাণ্ডা আমাদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের সোণাপুর গ্রামখানি খুব বড় নহে; বড়মানুষের বাসও তেমন বেশী নহে; প্রায় সকলেই আমাদেরই মত সামান্য অবস্থার গৃহস্থ; তাই প্রতি বৎসরই পাণ্ডা-ঠাকুরের শুভাগমন হয় না—জগন্নাথ-দর্শনার্থী যাত্রী বছরে-বছরেই পাওয়া যায় না; দুই চারি বৎসর অন্তর পাণ্ডা-ঠাকুর আসেন এবং যেমন করিয়া হউক, দশ বিশ জন যাত্রী লইয়া যান।

আমি যেবারের কথা বলিতেছি, তাহার পূর্ব্ব বৎসর আমার পিতাঠাকুর স্বর্গারোহণ করেন। আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত দয়ালচন্দ্র দে মহাশয়—আমার ও আমার মাতাঠাকুরাণীর তখন অভিভাবক। পিতাঠাকুর বর্ত্তমানেই কাকা পৃথক্ হন, বাড়ীও পৃথক্ করেন। আমরা জাতিতে সুবর্ণবণিক্।

পূর্ব্বে পিতাঠাকুর ও কাকা মহাশয় যখন একান্নভুক্ত ছিলেন, তখন আমাদের একখানি বেণে-মস্‌লার দোকান ছিল; পৃথক্ হইবার পর পিতা একখানি নূতন দোকান করেন, পূর্ব্বের দোকানখানি কাকাকেই দান করেন।

পিতার মৃত্যু-সময়ে আমার বয়স ১৩ বৎসর; সে সময়ে আমি কি আর নিজে দোকান চালাইতে পারি? তাই আমার এক মামাতো ভাই দোকানের ভার গ্রহণ করেন,—গিরিশ দাদা আর আমি দুজনে দোকানের কাজকর্ম্ম করি। গিরিশ দাদা মাসে চোদ্দ টাকা পান, আর আমাদের বাড়ীতেই থাকেন। এই খরচ বাদে যাহা লাভ হয়, তাহাতেই আমাদের মাতাপুত্রের সংসার এক রকম চলিয়া যায়;—দিদির বিবাহ বাবাই দিয়া যান; দিদিদের অবস্থা ভাল। সংক্ষেপে এই আমাদের সাংসারিক অবস্থা।

জগন্নাথের পাণ্ডা-ঠাকুর গ্রামে আসিয়া বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া যাত্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমার কাকা জগন্নাথ দর্শনে যাইবেন, স্থির করিলেন। মা কি এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে পারেন? তিনি কাকাকে ধরিয়া বসিলেন যে, তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হইবে। কাকার আর তাহাতে আপত্তি কি? তিনি জানিতেন, মায়ের তীর্থভ্রমণের ব্যয়-ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে না; সুতরাং তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু গোলযোগ বাধিল আমাকে লইয়া; আমি বলিলাম, "মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

কাকার তাহাতে আপত্তি, মায়েরও আপত্তি। আমি ছেলেমানুষ,—জগন্নাথের পথ বড় খারাপ; নানা বিপদের সম্ভাবনা; এক মাসের পথ হাঁটিতে হয়; রাস্তায় চোর-

ডাকাত আছে ; যাত্রীদের প্রায়ই নানা পীড়া হয়,—অনেকে প্রাণত্যাগ করে। এ অবস্থায় আমার মত ছেলেমানুষকে কিছুতেই সঙ্গে লইতে পারা যায় না। আমি যদি সঙ্গে যাইতে চাই, তাহা হইলে কাকা মাকে লইয়া যাইতে পারিবেন না—স্পষ্ট জবাব দিলেন। মা আমাকে অনেক বুঝাইলেন ; কিন্তু আমি কাঁদিয়া আকুল হইলাম। অবশেষে মা বলিলেন "তা হ'লে আমার অদৃষ্টে আর জগন্নাথ দর্শন নেই। যাক্,—আমি আর যাব না। পাপীর কি এমন ভাগ্য হয়।" তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রার বাসনা ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন।

লেখাপড়া অতি সামান্যই শিখিয়াছিলাম। বেণের ছেলে ; একটু লিখিতে-পড়িতে পারিলে এবং হিসাবপত্র রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট। তাই বাবা আমাকে স্কুলে দেন নাই,—পাঠশালার বিদ্যা কথঞ্চিৎ আয়ত্ত করিয়াই বার বৎসর বয়সে আমি দোকানে যাইতে আরম্ভ করি। সে ভালই হইয়াছিল, নতুবা তাহার এক বৎসর পরেই যখন বাবা মারা গেলেন, তখন যদি আমি দোকানের কাজ মোটেই না জানিতাম, তাহা হইলে বড়ই বিপদ হইত। তা' লেখাপড়া জানি আর না-ই জানি—বিদ্যা না-ই থাকুক, মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস আমার সেই চোদ্দ বৎসর বয়সেই বুকে বড়ই বাজিল। আমি দেখিলাম, মায়ের তীর্থধর্ম্মের আমিই অন্তরায় হইলাম। তখন আর নিজের কথা ভাবিলাম না,

মায়ের তীর্থধর্ম্মে বাধা দিব না, এই কথা আমার মনে হইল। আমি মাকে বলিলাম "আমি তোমার সঙ্গে যাব না মা! তুমি একেলাই কাকার সঙ্গে যাও। আমি আর গিরিশ দাদা বাড়ীতে বেশ থাক্‌তে পারব। আর কতদিনই বা, বড় বেশী হ'লে মাস দুই—কেমন মা?"

মা বলিলেন "তা বই কি। দুটো মাস তোরা দুই ভাই তোর কাকীমার কাছে থাকিস, কোন কষ্ট হবে না। ছোট-বৌ এতে অসম্মত হবে না, কি বল ঠাকুরপো?"

কাকা বলিলেন "তার আর কথা কি! তুমি ত জান বড়বৌ, আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে পৃথক্ হয়েছিলাম। দাদাই জোর ক'রে পৃথক্ ক'রে দিলেন; বল্লেন, যে দিন-কাল পড়েছে, তাতে পৃথক্ হ'লেই মনের মিল থাক্‌বে। তাই ত পৃথক্ হয়েছিলাম—আমার কি আর ইচ্ছে ছিল। তারপর দাদা মারা গেলেও ত তোমাকে ব'লেছিলাম, আর কেন, দুই দোকান এক ক'রে ফেলে এক সঙ্গে থাকি। তখন তোমার ভাই-ই ত তাতে বাধা দিলেন। যাক্, সে কথা থাক্। সুরেশ আর গিরিশ আমার ওখানেই থাক্‌বে। আর তুমি ত আমার সম্বন্ধী রাইচরণকে জান। সেই এ মাস দুই এখানে থেকে আমার দোকান দেখ্‌বে, বাড়ীরও ভার নেবে।"

মা বলিলেন "তা হ'লে ঠাকুরপো, ছোটবৌকেও নিয়ে যাই না। এমন সুবিধে কি তার আর মিল্‌বে!

ছেলেপিলে ত হোলো না যে, তাই নিয়ে থাক্‌বে। তাকেও সঙ্গে নিয়ে চল।"

কাকা বলিলেন, "এই শোন কথা! আজ তিনদিন ধ'রে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করেছি, এখন তুমি আবার তাল তোল। শেষে দেখ্‌ছি কারও যাওয়া হবে না। আর তার কি এখন তীর্থধর্ম্মের সময়। সে পরে হবে। তুমি আর ও-গোল তুলো না বড়বৌ! সুরেশ বাড়ী রইল; তাকে দেখ্‌বে কে?"

"সে কথা ঠিক ব'লেছ ঠাকুরপো! তার হাতে ছেলেকে সমর্পণ ক'রেই ত আমি যাব। না, সে থাক্। বেঁচে থাক্, তোমার লক্ষ্মী-শ্রী বাড়ুক, সে কত তীর্থধর্ম্ম করতে পারবে।"

(২)

২রা আষাঢ় শুভদিনে গ্রামের আরও আটদশজন মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে কাকা ও মা জগন্নাথ দর্শনে যাত্রা করিলেন। এখনকার মত সে সময় রেল হয় নাই। তখন আমাদের গ্রাম থেকে হেঁটে গিয়ে রেলে কলিকাতায় যেতে হোত; সেখান থেকে নৌকায় উঠে উলুবেড়ে; তারপর যাদের অবস্থা ভাল নয়, তারা সারা-পথ হেঁটে যেত। পথে চটিতে থাক্‌তে হোতো। রাস্তা কি কম! পাণ্ডা-ঠাকুর গল্প করত, সে দেশে আমাদের দেশের মত ক্রোশ নয়—ডালভাঙ্গা ক্রোশ। রাস্তার কোন স্থানের গাছ থেকে একটা ডাল

ভেঙ্গে নিয়ে পথ হাঁটতে-হাঁটতে যখন ডালের পাতাগুলো শুকিয়ে যেত, তখন এক ক্রোশ পথ চলা হোত। তাই, তখন লোকে বল্‌ত, বাবা জগন্নাথের কথা যেন মনে হয়, পথের কথা মনে না হয়। এই রকম কত কথা যে সে সময়ে শুনেছিলাম, তার সব কি আর মনে আছে।

মা চলে যাবার পর প্রথম-প্রথম প্রতিদিনই তাঁর কথা মনে হোত, গিরিশদাদার সঙ্গে মায়ের কথাই হোতো। দোকান বন্ধ ক'রে যখন কাকার বাড়ীতে রাত্রিতে আহার করতে যেতাম, তখন কাকীমার কাছে ব'সে মায়ের কথাই বল্‌তাম।

একদিন কাকীমা বল্‌লেন, "দেখ্‌ সুরেশ, তুই যে রোজই কেবল মায়ের কথা বলিস্‌, তাতে তাঁর তীর্থধর্ম্ম হবে না। এত কষ্ট ক'রে জগন্নাথে গিয়েও দিদি ঠাকুরের দর্শন পাবেন না।"

আমি বলিলাম, "ঠাকুরের দর্শন পাবেন না কেন? আমরা এখানে ব'সে কথা ব'ল্‌ছি, তাতে কি দোষ হচ্চে।"

কাকীমা বল্‌লেন, "ওরে হাবা ছেলে, তুই যখন এখানে ব'সে তোর মায়ের কথা ভাবিস্‌, তখন তিনি যেখানেই থাকুন, সেখানেই তাঁর তখন তোর কথা মনে হয়। শুনেছি, —অদেষ্টে নেই, নিজের কথা ব'ল্‌তে পারিনে—শুনেছি ছেলে কাঁদলে, কি ছেলের কষ্ট হ'লে, যত দূরেই হোক না কেন, মায়ের প্রাণ অমনি কেঁদে উঠে। ও নাড়ীর বাঁধন বড়

শক্ত বাঁধন। তুই যদি এখানে ব'সে তোর মায়ের জন্য এখন কাঁদিস্, তা হোলে সেই পুরীর পথে চটিতে বসে এই এখনই তোর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বেই ; তাঁর মনে তোর কথা জাগ্‌বেই। তা হ'লে তাঁর আর জগন্নাথ দর্শন হবে না।"

আমি বলিলাম, "সে কি করে' হবে কাকীমা!"

কাকীমা বল্‌লেন, "তাই হয় রে বাবা, তাই হয়! তুই তাঁর কথা যখন-তখন ভাবলে, তাঁকেও তোর কথা ভাবতেই হবে। তার ফল কি হবে শুন্‌বি? আমার বাপের বাড়ীর গাঁয়ের একজন বিধবা—এই তোর মায়ের মত—একবার তোরই মত, কি তোর চাইতে হয় ত একটু ছোট, একটী ছেলেকে বাড়ীতে রেখে জগন্নাথ গিয়েছিল। বিধবা সারা পথ শুধু ছেলের কথাই ভাব্‌ত, ছেলের কথাই বল্‌ত ;—এই আমার খোকা এখন ভাত খাচ্ছে, এই আমার খোকা এখন হয় ত খেলা কর্‌ছে, এই আমার খোকা বুঝি কাঁদ্‌ছে, এই আমার খোকার বুঝি ক্ষিদে পেয়েছে ;—হতভাগী সারাটা পথ শুধু এই ক'রেই গিয়েছিল। সাথী যারা ছিল, তারা কত নিষেধ কর্‌ত,—বল্‌ত, খোকার মা, খোকার কথা ভেব না, জগন্নাথদেবের কথা ভাব। সে কিন্তু তা পারত না,—তার মন পড়ে ছিল যে তার খোকার কাছে। তারপরে কি হোলো শুন্‌বি? পুরীতে পৌছে যখন তারা ধূল-পায়ে জগন্নাথ দর্শন কর্‌তে মন্দিরে গেল, তখন আর সকলে ঠাকুরের চাঁদমুখ

বেশ দেখ্‌তে পেলে, কিন্তু ঐ হতভাগী খোকার মা বল্‌তে লাগ্‌ল কি— 'কৈ, মন্দিরের মধ্যে ত জগন্নাথ দেখ্‌তে পাইনে ; ও যে আমার খোকার মুখ।' তিন দিন উপরি-উপরি দেখ্‌তে গেল, খোকার মুখ ভিন্ন আর কিছু দেখ্‌তে পেলে না। রথে যখন ঠাকুরকে তোলা হোলো, তখনও দেখ্‌তে গেল ; কিন্তু সে চাঁদমুখ আর তার দর্শন হোলো না,—সে তার খোকার মুখই দেখ্‌লে। ঠাকুর তাকে দর্শনই দিলেন না। জগন্নাথ যে-সে ঠাকুর নয় সুরেশ! তাঁরই দিকে মন দিয়ে না গেলে তিনি দর্শন দেন না। আরও শুন্‌বি? গল্প শুনেছি, এক বুড়ি একবার জগন্নাথে গিয়েছিল। যাবার সময়ে তার বাড়ীর উঠানে একটা সজ্‌নে গাছে ফুল ফুটতে দেখে গিয়েছিল। বুড়ী সারা-পথ সেই সজ্‌নের ফুল আর খাড়ার কথা ভাব্‌তে-ভাব্‌তে গিয়েছিল ; মন্দিরে গিয়ে সে না কি সজ্‌নে খাড়াই দেখেছিল। জানিস্‌, এ সব সত্যি কথা। তাই তোকে বল্‌ছি, মায়ের জন্য অত কাতর হ'লে তোর মায়ের মনও তোর জন্য কাতর হবে ; তখন তিনি মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের দর্শন পাবেন না, দেখ্‌বেন তোর মুখ। এত কষ্ট, এত খরচ, সব বৃথা হ'য়ে যাবে।"

কাকীমার কথা শুনে মনে বড়ই ভয় হলো। তা হ'লে ত মায়ের কথা ভাবা ঠিক নয়! কিন্তু মন কি সে কথা বোঝে। সংসারে মা বিনে আমার যে আর কেউ নেই ;

এই চোদ্দ বৎসর তাঁরই স্নেহ-ধারায় যে আমি পুষ্ট, বর্দ্ধিত। আমার সেই স্নেহময়ী জননীর কথা যে সময়ে-অসময়েই আমার মনে হোতে চায়,—কোন বাধা-বিপত্তির কথা যে মনে থাকে না! দুই-এক দিনের পথ হোলেও না হয় মনকে প্রবোধ দিতে পারতাম; কিন্তু এ যে দীর্ঘ পথ; আর সে পথে কত বিপদ, কত কষ্ট। মা যে কোন দিন এত কষ্ট সহ্য করেন নাই। পথে তাঁর যদি অসুখ হয়, তা হ'লে কে তাঁকে দেখ্‌বে? কাকা কি তেমন করে তাঁর সেবা কর্‌বে? ডাক্তার-কবিরাজ কি আর মিলবে? মা যদি মারা যান। কথাটা আমি ভাবতে যে পারি না। আমি তখন কাতর ভাবে জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করতাম, হে ঠাকুর, আমার মাকে ঘরে ফিরে এনে দাও। এ সংসারে মা-ছাড়া আমার কেউ নেই ঠাকুর!

কাকীমার সঙ্গে কথা হওয়ার পর মুখ-ফুটে আর মায়ের কথা কাহাকেও বল্‌তাম না; তার ফল এই হোতো যে, মনে সর্ব্বদাই তাঁর কথা উঠ্‌ত; হাজার চেষ্টা করেও আত্ম-সংবরণ কর্‌তে পারতাম না।

সেবার ২৪শে রথ। ২৪শে পর্য্যন্ত চুপ করেই ছিলুম। তারপর ত আর ভয় ছিল না, মায়ের জগন্নাথ দর্শন ত হয়ে গিয়েছে, এখন ত তিনি বাড়ী ফিরবেন, এখন আর তাঁর কথা বল্‌লে তাঁর ঠাকুর দর্শনের কোন ব্যাঘাতই হবে না। তখন আমি দিন গণতে আরম্ভ করলাম। ২রা তারিখে

তাঁরা বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন; ২০শে ২১শে নিশ্চয়ই পুরীতে পৌঁছে গিয়েছেন। তা হোলে যেতে লেগেছে আঠারো দিন। ২৪শে রথ হয়ে গেছে; তাঁরা না হয় আরও একদিন কি দুই দিনই সেখানে বাস করবেন। তা হোলে ২৬শে, নিতান্ত না হয় ২৭শে নিশ্চয়ই যাত্রা করেছেন। সেই ২৭শে থেকেই আমি দিন গণতে আরম্ভ করে দিলাম! কোথায় সোণাপুর, আর কোথায় সেই অজানা-অচেনা পথ—পুরী। সে পথের কোন সংবাদই আমি জান্‌তাম না; তবুও প্রতিদিন আমি সেই পথের কথা ভাবতাম। এই একদিনে মা তিন ক্রোশ পথ এসে একটা চটিতে উঠেছেন; এই তার পর-দিন মা খুব জোরে পথ চল্‌ছেন; তাঁকে শীঘ্র বাড়ী আস্‌তে হবে, আমি যে তাঁর পথ চেয়ে বসে আছি, মা ত তা বেশ বুঝতে পারছেন। কাকী-মা যে বলেছেন, মায়ে-ছেলের প্রাণ এক তারে বাঁধা। আমি যে এত আকুল হয়েছি, মা সে কথা বেশ জানতে পারছেন। পথে বিলম্ব,—তা তিনি কিছুতেই করতে পারবেন না। যেতে যদি আঠারো দিন লেগে থাকে, তা হ'লে ফিরতে পনর দিনের বেশী কিছুতেই লাগ্‌বে না—মা'কে যে ছুটে আস্‌তে হবে। যারা সঙ্গে গিয়েছে, তারাও ছুট্‌ছে বই কি; সবারই ত বাড়ী-ঘর আছে। কাকা কি আর পথে বিলম্ব করতে পারেন;—পরের উপর দোকান, সংসার ফেলে তিনি কি আর নিশ্চিন্ত আছেন। আমি

সোণাপুরে আমাদের দোকানে বসে প্রতিদিন তাঁদের পথ-হাঁটা দেখি, তাঁদের জোরে পথ চলাই, পথে বিশ্রাম করতে দিই না ; এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা হোলেই চটি থেকে পথে নামাই, ঝড় বৃষ্টি বা প্রখর রৌদ্র কিছুই মানি নে ;—আমার যে গরজ বেশী।

পনর দিন চলে গেল, যোল দিনও গেল। কৈ, মা ত ফেরেন না ; গ্রামের যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদেরও সংবাদ নাই। কাকারই বা কি বিবেচনা ! সেই পুরী পৌছে একখানি পত্র লিখেছিলেন, তারপর এই এত দিনের মধ্যে একটা সংবাদও দিলেন না ; দুই লাইন একখানি পত্র লিখ্‌তে এত আলস্য !

আঠারো দিনও গেল—উনিশ দিন এল। যেতে ত আঠারো দিনের বেশী লাগেই নাই ; তবে আসতে এত বিলম্ব হচ্চে কেন ? কাকার ত কোন অসুখ করে নাই ? মা ত ভাল আছেন ? আমি যে আর ভাবতে পারি না !

(৩)

আরও দুইদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময় দোকানে আছি, সংবাদ পেলাম, এই মাত্র পুরীর যাত্রীরা ফিরে এসেছেন। গিরিশ দাদাকে দোকান বন্ধ করে আসতে ব'লে আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীর দিকে ছুটলাম।

আমাকে অধিক দূর যেতে হল না ; পথের মধ্যেই কাকার সঙ্গে দেখা হল। তিনি বিষণ্ন বদনে অতি ধীরে-ধীরে বাজারের দিকেই আস্‌ছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় নিয়ে বল্‌লাম, "কাকা, তোমরা কতক্ষণ এসেছ ?"

কাকা আমার কথার উত্তরে 'হা হা' করে কেঁদে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখে আমি যে কি করব, ভেবে পেলাম না ; তবে মায়ের যে কিছু হইয়াছে, তা বেশ বুঝতে পারলাম। তবুও প্রাণপণ শক্তিতে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "মা ভাল আছে ত ?"

কাকা আর চুপ করে থাকতে পারলেন না, কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "ওরে বাপ আমার, বড়-বৌ আমাদের ছেড়ে গেছে।"

আর কি শুনব ! শুনবার যা, তা শুনলাম ! আমার তখন কি হল, আমি চীৎকার করে কাঁদতে পারলাম না —কে যেন আমার বুকের উপর দশ মণ ভার চাপিয়ে দিল, কে যেন আমার গলা চেপে ধরল।

আমার এই অবস্থা দেখে কাকা আমাকে তাঁর কাঁধের উপর ফেলে বাড়ীর দিকে ফিরলেন,—তখন সত্য-সত্যই আমার চলবার সামর্থ্য ছিল না, কথা বলবার শক্তি ছিল না।

বাড়ী আসিলে কাকী-মা আমাকে কোলের মধ্যে টেনে

নিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন—আমাকে আর কি সান্ত্বনা দেবেন। একটু পরে নিজে কিঞ্চিৎ শান্ত হয়ে বল্‌লেন, "বাবা, আর কেঁদে কি কর্‌বে। জগন্নাথ তাঁকে টেনেছিলেন, তাই তিনি চলে গেছেন। তুমি ত সবই বোঝ বাবা, তোমাকে আর কি বল্‌ব। হায় হায়, বিদেশে-বিভূঁয়ে কেমন করেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে গিয়েছে।"

তখনও কান্না থামে না ; আমার শরীরের সব শুকিয়ে গিয়েছে ; চক্ষে জল আস্‌বে কোথা থেকে।

রাত্রিতে কাকার মুখে যা শুনলাম, তার সংক্ষেপ কথা এই যে, ফিরবার সময় কোন্ একটা চটিতে এসে মায়ের ওলাউঠা হয়। সেখানে আর ডাক্তার-কবিরাজ কোথায় পাওয়া যাবে। চটিওয়ালা ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে চায় ; সঙ্গীরা অন্য চটিতে চলে গেল, চটিওয়ালাকে বেশী পয়সা দিয়ে কাকা সারারাত্রি মায়ের সেবা করলেন ! কিছুতেই কিছু হোলো না, একেবারে সাক্ষাৎ কাল এসে ধরেছিল। ভোরের বেলায় মার দেহত্যাগ হলে কাকা প্রায় ত্রিশ টাকা খরচ করে অনেক কষ্টে লোকজন ডেকে মায়ের সৎকার করেছিলেন। সঙ্গী যাত্রীরা ভোরেই সে চটি ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিল ; কাকা অনেক কষ্টে এসে তাদের সঙ্গ পান। এ ৭ই শ্রাবণের কথা। যেদিন কাকা বাড়ী এলেন, সেদিন ১৫ই শ্রাবণ। ৮দিন হইল মা দেহত্যাগ করেছেন।

সব মিটে গেল। বাবা গেলেন ;—মা ছিলেন, তিনিও গেলেন। চোদ্দ বৎসর বয়সে আমি একেবারে অনাথ হলাম। আপনার বলতে এক দিদি ;—সেও ত পরের ঘরে।

কাকাই কর্ত্তা হয়ে মায়ের শ্রাদ্ধের আয়োজন করতে লাগলেন ; দিদিকে তাঁর শ্বশুর-বাড়ী থেকে নিয়ে এলেন ; বড় মামা ও মামীকে আনা হোলো ; যেখানে যে কুটুম্ব ছিল, সকলকেই সংবাদ দেওয়া হোল,—এই যে আমার জীবনের শেষ কাজ। কাকা মায়ের শ্রাদ্ধে খরচপত্র একটু কম করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু আমার ভগিনী ও ভগিনীপতি তাতে সম্মত হলেন না। মায়ের বাক্সে কিছু টাকা পাওয়া গেল, কিন্তু সে খুব বেশী নয়—মোটে আটশত টাকা। দিদি বল্‌লেন, "আট-শ টাকা! সে হতেই পারে না ; আমি বাবার শ্রাদ্ধের সময় নিজের চক্ষে দেখে গিয়েছি, নগদ প্রায় আড়াই হাজার টাকা ছিল, এর পর কিছু লগ্নীও ছিল। সে সব টাকা কোথায় গেল।"

কাকী-মা বল্‌লেন, "বোধ হয় লগ্নী আরও বাড়িয়ে গেছেন। তারপর জগন্নাথে যাওয়ার সময়ও পাঁচ-শ টাকা নিয়ে গিয়েছিলেন ; সে ত আমিই জানি। ওদের জিজ্ঞাসা করলুম, মরবার সময় দিদির কাছে কি টাকা-কড়ি ছিল ; তাতে শুন্‌লাম্, সে সব কি তখন খোঁজ নেবার সময় ; যদি কিছু থেকে থাকে, তা দিদির সঙ্গেই গেছে।"

দিদি বল্‌লেন, "যাক্, মা-ই যখন গেলেন, তখন তাঁর কথা আর ভেবে কি হবে।"

কাকী-মা বল্‌লেন, "কথা ত সত্যি, কিন্তু মরবার সময় দিদির কাছে নিশ্চয়ই দেড়শ-দুশো টাকা ছিলই ছিল। তোমার কাকার কি সে সব দেখা উচিত ছিল না; সে তার কিছুই জানে না বল্লে।"

আমি বল্‌লাম, "সে কথায় আর কাজ কি, আমার যা আছে তাই দিয়েই মায়ের কাজ ভাল করে হোক্—আর ত মায়ের জন্য কিছু খরচ কর্‌তে হবে না।" সেই ভাবেই আয়োজন হতে লাগল।

দেখ্‌তে-দেখ্‌তে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হল। আত্মীয়-কুটুম্ব, প্রতিবেশীতে বাড়ী ভরে গেল; কাকার আর অবকাশ নাই। সমস্ত আয়োজনই যথারীতি হল। আমাদের বৃষোৎসর্গ করতে নেই, পূর্ব্বেও কোন শ্রাদ্ধে তাহা হয় নাই; সুতরাং সে আয়োজন করা হোল না।

যথাসময়ে সকলে সভাস্থ হলেন, পুরোহিত মহাশয় সমস্ত গোছাইয়া লইলেন। আমি সবে শ্রাদ্ধাধিকারীর আসন গ্রহণ করতে যাব—বেলা তখন প্রায় দশটা—সেই সময় বাড়ীর বাহিরে মহা গোলযোগ আরম্ভ হল। কি হল দেখবার জন্য কয়েকজন লোক বাহিরে ছুটে গেল, কাকাও গেলেন। একজন তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে, বলে উঠ্‌লেন, "ওরে শ্রাদ্ধ রাখ্; যাঁর শ্রাদ্ধ কর্‌তে বসেছ, তিনি

এসে হাজির! সুরেশের মা মরেন নাই; ফিরে এসেছেন।”

মা মরেন নাই—ফিরে এসেছেন! সে কি কথা! এও কি হয়? আমার মাথা ঘূরে গেল। আমি অজ্ঞান হয়ে প’ড়ে গেলাম।

আমার যখন জ্ঞান হোলো, তখন দেখলাম সত্যসত্যই মা আমাকে কোলে করে বসে আছেন, দিদি আমার পাশে। আমি অতি ধীরে বল্‌লাম, “মা, মা গো!”

“এই যে বাবা আমি।” বলে’ মা আমাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। আর ত অবিশ্বাস নাই—সত্যই ত আমার মা ফিরে এসেছেন। সে যে কি আনন্দ, তা কি আমি বল্‌তে পারি। যে মা আজ একমাস মারা গিয়েছেন, সেই মা এসেছেন—ওরে আমার মা এসেছেন! আমার ইচ্ছা হতে লাগল, আমি প্রাণপণে চীৎকার করে বলি, “ওরে আমার মা ফিরে এসেছেন।”

এই সময় কাকার বাড়ী থেকে একজন লোক এসে বলল, “ওগো, তোমরা শীগ্‌গির এস, ছোট-কর্ত্তা গলায় দড়ি দিয়েছেন।”

এই কথা শুনেই মা ও কাকী-মা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন এবং দিদিকে আমার কাছে থাকতে বলে কাকার বাড়ীতে চ’লে গেলেন। আমার যাবার শক্তি ছিল না;—আর শক্তি থাক্‌লেও আমি যেতাম না। কিন্তু

কাকার কি হ'ল জান্‌বার জন্য বড়ই আগ্রহ হ'ল। দিদিকে বল্‌লাম, "দিদি, তুমি একবার খবর নিয়ে এস ত, কি হয়েছে।"

দিদি প্রথম আপত্তি করল ; শেষে আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখে চলে গেল এবং একটু পরেই এসে বল্‌ল, "আমরা তোমাকে নিয়ে বিব্রত ছিলাম। কাকা যে কখন চলে গিয়েছেন, কেউ বল্‌তে পারে না। তিনি বাড়ী গিয়েই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছেন। পাড়ার সকলে দড়ি কেটে নামিয়েছে, ডাক্তার এসেছে, কাকার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। সকলেই বল্‌ছে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। মা এখন আর আস্‌তে পারবেন না।" কাকার শোচনীয় পরিণাম শুনে তাঁর মহা অপরাধের কথা ভুলে গেলাম, তাঁর জন্য বড়ই কষ্ট হোল।

(৪)

এই ঘটনার দুই দিন পরে এক সময় মাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, "মা, এ কয়দিন এই সব গোলমালে কোন কথাই জান্‌তে পারি নাই। তুমি কি করে বেঁচে এলে, বল না মা ; কাকা ত তোমাকে মেরে ফেলে, তোমার সৎকার পর্য্যন্ত করে এসেছিলেন ; তারপর কি হলো।"

মা বল্‌লেন, "সে কথা তোর আর শুনে কাজ নেই। আর যদি শুন্‌তে হয়, অন্যের কাছে শুনিস্—সকলেই শুনেছে। আমি আর সে কথা তোর কাছে বল্‌ব না।"

অনেক অনুরোধে মা বল্‌লেন, "নিতান্তই ছাড়বিনে। তবে শোন্। পথের কথা, আর জগন্নাথ দেবের কথা তোকে আর কি বল্‌ব,—তুই তার কি-ই বা বুঝ্‌বি। প্রথম রথের পরদিনই আমার বেরুবার ইচ্ছা,—তখন ত আর ঠাকুরের টান নেই—তোর টান। ঠাকুর তার খুব ফল দিয়েছেন—খুব সাজা দিয়েছেন। সঙ্গে যারা ছিল, তারা সকলেই আরও দু'দিন থাকতে চাইলে। কি করি, থাকতে হোলো; কিন্তু প্রাণ তখন বাড়ীর দিকে—তোর দিকে! তিন দিনের দিন সকলে মিলে বেরিয়ে পড়লাম। আমার তখন এমন হয়েছে যে, দুদিনের পথ একবেলায় আমার চল্‌তেও আপত্তি নেই, আর সকলেরও প্রায় তাই। ঠাকুর বল্লেন, রও বেটী, তোর শীগ্‌গির বাড়ী যাওয়া ঘুচিয়ে দিচ্ছি! দশ দিন বেশ এলাম, এগারদিনের-দিন পথের মধ্যে আমার পেটের অসুখ হোলো। কাউকে সে কথা বল্‌লাম না; অতি কষ্টে পথ চল্‌তে লাগ্‌লাম। সন্ধ্যার সময় একটা চটিতে এসে আমি একেবারে অসাড় হয়ে পড়লাম। খুব ভেদ-বমি হতে লাগ্‌ল। আমরা যে ঘরটায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, আমার অবস্থা দেখে সঙ্গীরা সে ঘর ছেড়ে আর একটা ঘরে চলে গেল। তোর কাকা আমার কাছে বসে থাক্‌ল। কেমন করে চটিওয়ালা সেই খবর পেল। আর যাবে কোথা;—সে একেবারে একখানা লাঠি হাতে করে এসে বল্‌ল 'এখনই বেরোও, নইলে মেরে তাড়িয়ে দেব'। ঠাকুরপো কত মিনতি করতে লাগ্‌ল, বেশী পয়সা

দিতে চাইল; কিছুতেই সে রাজী হোল না। তখন কি আমার আর উঠবার শক্তি ছিল। অনেক কষ্টে বসে-বসে কোন রকমে বাইরে এলাম। এখন এই রাত্রে যাই কোথায়! নিকটেই একটা গাছ ছিল; তারই তলায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ক্রমে আমার মনে হোতে লাগল, আমার হাত-পা যেন অবশ হয়ে আস্ছে; তখন আর কথা বল্‌বার শক্তি নেই। তোর কাকা আমাকে সেই অবস্থায় একলা ফেলে চটিতে গেল। সেখানে কি হোলো জানিনে। একটু পরেই দেখি, সকলে চটি থেকে সেই রাত্রেই বেরিয়ে পড়ল। বুঝলাম, আমাকে এই গাছতলায় একেলা ফেলে রেখে সাথীরা সবাই পালাচ্ছে। তখনও কিন্তু মনে হয় নাই, ঠাকুরপোও চলে যাবে—সে কি কখন হয়। একটু পরেই দেখি ঠাকুরপো আমার কাছে এল। আমার মনে আশা হোলো, সে আমাকে এমনি করে ফেলে রেখে যাবে না। ঠাকুরপো এসে কি করল শুন্‌বি। সে এসে আমার নাকের কাছে হাত দিল—দেখ্‌ল আমি বেঁচে আছি কি না। তারপর আমার কোমরে যে টাকার গেঁজে বাঁধা ছিল, সেইটি টেনে খুলে নিল। আমার তখনও বেশ জ্ঞান আছে, কিন্তু কথাও বল্‌তে পার্‌ছিনে, হাত-পাও নাড়তে পারছিনে। সে তখন চলে যায় দেখে আমি প্রাণপণে চীৎকার করবার চেষ্টা করলাম,—আমার কি তখন সে শক্তি ছিল? সেই অন্ধকার রাত্রিতে গাছতলায় আমাকে ফেলে সে সত্যিই তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। আমার বুকের ভিতর তখন

যে কি করে উঠল, তা তোকে কি করে বুঝাব বাবা! সে অবস্থা যেন অতি বড় শত্তুরেরও কখন না হয়। তখন আমি সব ভুলে গেলাম—তোর মুখখানিও ভুলে গেলাম—ঘর-সংসারের কথা তখন আমার মনে এল না। আমার মনে এল বাবা জগন্নাথের কথা।—আমি তখন মনে-মনে তাঁকেই ডাকতে লাগ্‌লাম—তাঁরই পায়ে মন ঢেলে দিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার যেন কি হোল; আমার চক্ষের সুমুখে সব আঁধার হয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল; কিন্তু মনের মধ্যে—ওরে আমার বুকের মধ্যে—তখন দেখ্‌তে পেলাম ঠাকুরের সেই মুখখানি। তারপর কি হোলো তা জানিনে।

যখন আমার একটু জ্ঞান হোল—সে কতক্ষণ পরে তা কি করে বলব—যখন একটু জ্ঞান হোল, তখন যেন মনে হোলো, কে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে যে কি, তা তোকে বল্‌তে পার্‌ছিনে! আমার শরীরে যেন সেই হাত লেগে সব শীতল করে দিচ্ছিল। চোখ আর চাইতে পারিনে,—চোখের উপর কে যেন দশ মণ পাথর চাপা দিয়েছে ব'লে মনে হোল। অনেক চেষ্টা করে একবার চাইলাম। কি দেখ্‌লাম শুন্‌বি বাপ আমার! মুখে যে সে কথা আসে না,—কেমন করে সে কথা তোকে বল্‌ব। আমি চেয়ে দেখলাম ঠাকুর—সত্যিই ঠাকুর রে—সত্যিই জগন্নাথদেবের মুখ দেখ্‌লাম। তিনিই আমার পাশে ব'সে রয়েছেন—তাঁরই সেই চাঁদমুখ আমি দেখ্‌তে পেলাম। একবার—শুধু একবার দেখা;—তারপরই আবার চোখ

বন্ধ হ'য়ে এল! আমি চীৎকার ক'রে ডাকলাম—প্রভু, দয়াল ঠাকুর আমার—ঠাকুর, আর একবার আমার চোখ দুটো খুলে দাও—আর একবার তোমার চাঁদমুখখানি দেখ্‌তে দাও;—তারপর আর আমি চোখ খুলব না—আর আমি কিছুই চাইব না। হায় রে অভাগী, হায় রে আমার কপাল—ঠাকুরের আর দয়া হোলো না—আমার চোখ আর খুল্‌ল না। কিন্তু তখনও সেই শীতল হাত আমার গায়ে রয়েছে। আমার তখন মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল—আমি অতি ধীরে বল্‌লাম—একটু জল। সুরেশ, বাবা আমার, ভাল করে শোন্। সত্যিই আমার মুখে কে জল দিল। সে ত জল নয়—সে চরণামৃত। তেমন জল ত কখনও খাইনি,—কি যে তার গন্ধ—আর কি যে তার স্বাদ! সে অমৃত রে বাপ—সে অমৃত। আমার সকল জ্বালা-যন্ত্রণা যেন দূর হয়ে গেল। এ স্বপন নয় বাবা! সত্যি কথা। আমার শরীর যেন জুড়িয়ে গেল—আমার রোগ যেন পালিয়ে গেল। যাকে সন্ধ্যার পর সকলে মড়া মনে করে ফেলে গিয়েছিল, সে যে ভাল হয়ে গেল। হঠাৎ গাছের উপর একটা পাখী ডেকে উঠ্‌ল। সেই ডাকে আমার বুকে যেন বল এল। আমার চোখ খুলে গেল। আমি চেয়ে দেখি, ভোর হয়ে গেছে; পথ দিয়ে যাত্রীরা সব যাচ্ছে। কিন্তু, আমার কাছে ত কেউ নেই—সেই গাছতলায় আমি একেলা শুয়ে আছি। শরীরে কোন যন্ত্রণা নেই; রাত্রে যে মরতে বসেছিলাম, তেমন বোধও হোলো না;—আমার

যে অসুখ হয়েছিল, তার চিহ্নমাত্রও নেই। আমি তখন উঠে বসে হাত যোড় করে ঠাকুরকেই ডাক্‌তে লাগ্‌লাম—প্রভু, কাঙ্গালের ঠাকুর, এত দয়া তোমার এই অভাগীর উপর। বাবা, তোর মা কত ভাগ্যবতী! তোর মায়ের সব আশা পূর্ণ হয়েছে বাপ! আমার মত মহাপাপী ঠাকুরের চরণামৃত পেয়েছিল—তাই বেঁচে গেছে। তারপর আর কি? সঙ্গে পয়সা ছিল না—তাতে কি? যাবার সময় এত টাকা সঙ্গে থাক্‌তেও এক-এক দিন খেতে পাইনি; কিন্তু যখন একটী পয়সাও নেই, তখন দয়াল ঠাকুর আমাকে উপোস্‌ কর্‌তে দেন নি! ঠাকুর আমার জন্য আগে হোতেই সব ঠিক করে রেখে দিতেন—সব ঠিক! পথে যেখানে গিয়েছি, কাউকে বল্‌তে হয় নাই; আমাকে ডেকে লোকে খেতে দিয়েছে। এ তাঁরই খেলা--ওরে তাঁরই। উলুবেড়ের নৌকার মাঝী আমাকে নিয়ে এল—পয়সা নিল না; বল্‌ল 'তোমার কাছে ত কিছুই নেই বলে মনে হচ্চে; তোমাকে ভাড়া দিতে হবে না।' কে তাকে এ কথা বলে দিল? কল্‌কাতায় এসে শিয়ালদহের ষ্টেসনে এক পাশে বসে আছি; একটী বাবু এসে বল্‌ল 'মা, তুমি কোথায় যাবে?' আমি গ্রামের নাম বল্‌লাম। সে বল্‌ল 'এখানে বসে কেন? টিকিট কিন্‌লে না।' আমি কোন উত্তর দিলাম না। বাবুটী কি ভেবে চলে গেল;—একটু পরেই এসে আমাকে এক খানি টিকিট দিয়ে বল্‌ল 'এস মা, তোমাকে গাড়ীতে তুলে

দিচ্ছি।' এ সব তাঁরই খেলা রে, তাঁরই খেলা। পথে যারা খেতে দিয়েছিল, উলুবেড়ের সেই নৌকার মাঝী, আর ষ্টেসনের সেই বাবু—এরা সব আমার সেই কাঙ্গালের ঠাকুর। ঠাকুরই এই সব বেশ ধরে আমাকে তোর কাছে এনে দিয়ে গেলেন। বাবা, একটা কথা তোকে বলি ;—কোন দিন মানুষের দিকে চাস্‌নি ;—যখন বিপদে পড়বি, আমার সেই দয়াল ঠাকুর, সেই কাঙ্গালের ঠাকুরকে ডাকিস্—তোর কোন অভাব থাক্‌বে না। তোকে আজ আমার ঠাকুরের চরণে নিবেদন করে দিই।" এই বলিয়া মা আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন ;—আমার বেশ মনে হইল, কোন্ এক দেবতা আমাকে বুকে করে নিলেন। মায়ের 'রথযাত্রা'র ফলে আমার 'জীবন-যাত্রা'র পথ ঠিক হয়ে গেল—সেই চোদ্দ বৎসর বয়সেই আমি পথ পেয়েছিলাম্।

সে কথা আজ নয়—আর একদিন !

মহামায়ার মায়া

একটু বৃষ্টি হইলে প্রায় সব বাড়ীর আঙ্গিনায় জল দাঁড়ায়, পথে এক-হাঁটু কাদা হয়,—গ্রামের নাম কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর।

তা' এমন হয়,—কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন, তালপাতার সিপাহীর নাম নরসিংহ—অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠপুর সম্বন্ধে কিন্তু সে কথা বলা চলে না। যিনি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি এ স্থানের শোভা-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নামকরণ করেন নাই। তাঁহার নাম ছিল বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডল; তাই গ্রামের নাম বৈকুণ্ঠপুর। প্রত্নতাত্ত্বিকের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য এখনও গোপীনাথ মণ্ডলের বাড়ী হইতে পুরাতন দলিলপত্র বাহির করিয়া প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

দুইদশ-ঘর সৌভাগ্যবান মানুষ ছাড়া প্রায়ই দেখা যায় যে, এক পুরুষ উপার্জ্জন করেন, সঞ্চয় করেন,—দ্বিতীয় পুরুষ পায়ের উপর পা দিয়া ভোগ করেন, দুইহাতে টাকা উড়ান; তৃতীয় পুরুষের দিন-অন্ন জুটে না।

গোপীনাথ মণ্ডলেরও তাই হইয়াছে; তাহার পিতামহ বৈকুণ্ঠ মণ্ডল নীলকুঠীর দেওয়ানী করিয়া বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, জমাজমি বাড়ী-ঘর করিয়াছিলেন,

নিজের নামে এই বৈকুণ্ঠপুর গ্রামখানি বসাইয়াছিলেন, সম্ভবমত খরচপত্র, দান-ধ্যানও করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পুত্র হরেকৃষ্ণ মণ্ডল একেবারে নবাব হইয়া বসিলেন ; বাবুগিরি, ধুমধাম দেখে কে ? সৎকার্য্যে সামান্যই খরচ হইল, অসৎ-কার্য্যে একেবারে জলের মত টাকা বাহির হইতে লাগিল।

হরেকৃষ্ণের আমলের জমাখরচের ফর্দ্দ দাখিল করিয়া আর কাজ নাই। আর দশজন যেমন করিয়া উচ্ছন্ন যায়, হরেকৃষ্ণ সেই মহাজন-পন্থারই অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে হরেকৃষ্ণ-নন্দন গোপীনাথ পাইয়াছেন সামান্য একখানি জোত, কয়েকটী কোঠাঘর, এবং শূন্যগর্ভ পাঁচটী লোহার সিন্ধুক ; আর পাইয়াছেন, দেশজোড়া 'বড়মানুষ' নাম, পিতৃ-পিতামহ-কালাগত পালি-পার্ব্বণ, গৃহদেবতা নারায়ণ শিলা, আর একপাল পোষ্য,—তাহার মধ্যে কুপোষ্যই বেশী।

মণ্ডলেরা জাতিতে সদ্‌গোপ। গোপীনাথের যখন বিবাহের বয়স হইল, অর্থাৎ যখন তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর, তখন হরেকৃষ্ণ খুব ঘটা করিয়া ছেলের বিবাহ দিলেন ; অতি গরিবের ঘরের সুন্দরী মেয়ে ঘরে আনিলেন, সুতরাং পুত্রবধূর সঙ্গে-সঙ্গে বৌমার বিধবা মাতা, বিধবা ভগিনী এবং নাবালক ভ্রাতাকেও গৃহে স্থান দিলেন।

কলসীর জল তখনই প্রায় তিনভাগ কমিয়া গিয়াছিল। অনেক বড়মানুষের ঘরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন

তাঁহাদের অবস্থা মলিন হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাঁহারা সেই মলিনতা ঢাকিয়া রাখিবার জন্য ধূমধাম আরও বাড়াইয়া দেন; ভয়—পাছে কেহ দৈন্যের কথা টের পায়। হরেকৃষ্ণ শেষে তাহাই করিলেন। ছেলের বিবাহের পর তিনি যে বার বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন সমানেই চালাইয়াছিলেন; গোপীনাথও কিছু দেখেন নাই,—বড়মানুষের ছেলেরা যাহা করিয়া থাকেন, তাহাই করিয়া সময় কাটাইয়াছেন।

তাহার পর একদিন হরেকৃষ্ণের ডাক পড়িল; তিনি চলিয়া গেলেন। স্ত্রী, পুত্রবধূ এবং বড় আদরের আদরিণী একমাত্র পৌত্রী ইন্দিরা, একপাল আত্মীয়,—কেহই তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিল না।

দুইদিন যাইতে না যাইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল,—হরেকৃষ্ণ দেনায় ডুবিয়া গিয়া বহু আয়াসে বৈতরণী পার হইয়া গিয়াছেন। তা' বলিয়া ত আর এত-বড় লোকটার শ্রাদ্ধ বালির পিণ্ড দিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামের দশজন কল্যাণকামী, পুরোহিত মহাশয়, শুভানুধ্যায়ী শ্যালক নিধিরাম এবং অন্যান্য আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই গোপীনাথকে সাহস দিলেন—বাঁহা বায়ান্ন তাঁহা তিপান্ন—যে ষাট হাজার সেই সত্তর হাজার! ষাট হাজার টাকা ঋণ যদি শোধ হয়, তাহা হইলে আর দশহাজারও শোধ হইবে,—বাবা ত দ্বিতীয় বার মরিতে আসিবে না! গোপীনাথ কি করিবেন; দশজনের পরামর্শই গ্রহণ করিলেন—দশহাজার টাকা ধার

করিয়া মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করিলেন। তাহার পর মহাজনেরা সব বেচিয়া-কিনিয়া লইল; যাহা থাকিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

(২)

চৈত্রমাসে হরেকৃষ্ণ মণ্ডল মারা গেলেন, বৈশাখ মাসেই গোপীনাথ সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মহাজনদিগের ঋণ শোধ করিলেন। অনেকে পরামর্শ দিয়াছিল যে, খরচপত্র কমাইয়া ধীরে-ধীরে কিছু-কিছু করিয়া শোধ দেওয়া হউক;—গোপীনাথ কাহারও কথা শুনিলেন না। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা ব্যতীত ঋণ-শোধের অন্য উপায় নাই। বিলম্ব করিলে ঋণের পরিমাণ বাড়িবে ব্যতীত কমিবে না।

এই ঋণ শোধ করিতে গিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব গেল। তিনি দেখিলেন, ভদ্রাসনও রক্ষা করা যায় না। তখন বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের অর্থাৎ তাঁহার মাতার ও স্ত্রীর অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া ভদ্রাসন এবং ছোট একখানি জোত রক্ষা করিলেন। জোতের আর আয় কত? খাজনা-ট্যাক্স্ বাদে সাত আট শত টাকা তাঁহার ঘরে আসিতে পারে। এই সাত-আট শত টাকাতেই সংসার চালাইতে হইবে। আর ত উপায় নাই!

তাঁহার শ্যালক নিধিরাম, একটা কিছু কারবার করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিল। তিনি বলিলেন, "কারবার

করিতে মূলধন চাই। টাকা কোথায় পাইব? আর কারবারের আমি কি জানি?”

নিধিরাম কহিল, “দেখ গোপীবাবু, তুমি যাই বল—তোমার মায়ের হাতে, আর আমার দিদির হাতে নিশ্চয়ই কিছু টাকা আছে। তাঁরা এত দিন চাপিয়া রাখিয়াছেন। তোমার অবস্থার কথা ত তাঁরা বুঝ্‌ছেন। এখন যদি তুমি একটু কাঁদাকাটি ক’রে ধর, তা হ’লেই তাঁরা হাজার দু-হাজার টাকা নিশ্চয়ই বার ক’রে দেবেন।”

গোপীনাথ কহিলেন, “না নিধি, তাঁদের হাতে একটি পয়সাও নাই। তাঁদের কাছে টাকা থাক্‌লে কি তাঁরা গয়নাগুলো এমন ক’রে বেচ্‌তে দিতেন?”

নিধিরাম কহিল, “আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না; তাঁদের হাতে টাকা আছেই।”

গোপীনাথ কহিল, “না নিধি, এটা তোমার ভুল। এত যে কষ্ট হচ্ছে, তা চোখে দেখেও কি তাঁরা চুপ করে থাক্‌তে পারতেন?”

নিধি তখন কোন মহাজনের নিকট হইতে টাকা ধার করিবার পরামর্শ দিল।

গোপীনাথ বলিলেন, “সপরিবারে অনাহারে মরিব, তাও স্বীকার; কিন্তু নিধি, আমি ধার কর্‌তে পারব না—কিছুতেই না।”

নিধি কহিল, “তা হ’লে চল্‌বে কি করে? এত বড় সংসার; তারপর মান-সম্ভ্রম আছে, বারমাসে তের পার্ব্বণ

আছে, লোক-লৌকিকতা আছে; এ সব হবে কি করে?"

গোপীনাথ বলিলেন, "হবে না! যখন ছিল, তখন হয়েছিল; এখন যার সংসার চলাই ভার, তার পক্ষে ও-সকল ত্যাগ করতেই হবে।"

নিধিরাম বল্‌ল, "তা' হ'লে আমাদেরও ত পথ দেখ্‌তে হয়। সত্য কথা বল্‌তে কি গোপী বাবু, তোমাদের আশ্রয়ে এসে আমিও যে তোমাদের মতই হ'য়ে গিয়েছি। লেখাপড়া শিখ্‌লুম না, কাজকর্ম্মও এতদিন কিছুই করি নাই। তুমিও যেমন কিছু ভাব নাই, আমিও ভাবি নাই। মনে করেছিলুম, সপরিবারে তোমাদের অন্ন ধ্বংস করেই জীবন কাটিয়ে দেব। এ যে তোমাদের বাড়ী, আমার বাড়ী নয়,—এ কথা তোমার বাবা ত এক দিনও আমাকে বুঝতে দেন নি। এখন আমাদেরই বা কি উপায় হবে? আমারই যে পাঁচ ছয়টি লোক। এ সময় কোথায় তোমার সাহায্য করব, না তোমার উপরই বসে খেতে হচ্ছে। তার জন্যই ত বল্‌ছিলুম যে, কোন রকমে হাজার দুই তিন টাকা যোগাড় কর; দুই জনে খেটে-খুটে সংসার চালাই। চাই কি মা-লক্ষ্মী এক দিন মুখ তুলেও চাইতে পারেন।"

গোপীনাথ বলিলেন, "ভাই, তোমার মনের কথা বুঝ্‌তে পেরেছি। সংসারের এই অবস্থা দেখে তুমি কাতর হয়েছ এবং এখানে থাকতে তোমাদের কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে। কিন্তু নিধি, তোমরা যেতে পারবে না; আমার আর কেহই

নেই। এ সময় কি তুমি আমাকে ফেলে যাবে? সে হবে না ভাই! তোমার বয়স কম, তুমি লেখাপড়াও যা হয় কিছু শিখেছ; তুমি চেষ্টা করলেই কোন স্থানে একটা কাজকর্ম্ম জুটিয়ে নিতে পারবে; কিন্তু আমার ত আর উপায় নেই। তুমি ত জান, আমি অতি সামান্যই লেখাপড়া শিখেছিলুম; পয়সার ভাবনা ছিল না, আমোদ-আহ্লাদেই দিন কাটিয়েছি। এই আমার বয়স ২৭ বৎসর; এতদিনের মধ্যে মদ, গাঁজা দূরে থাক, আমি তামাক, পান পর্য্যন্ত খাইনে। শিখবার মধ্যে শিখেছি গান-বাজনা;—আর ত কিছু জানিনে। যাত্রার দলে বেহালা বাজাবার কাজ ছাড়া আমি আর ত কিছুই করতে পারিনে। এতকাল পরে দুটো অন্নের জন্য বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের নাতিকে কি যাত্রার দলে যেতে হবে? শেষে কি আমার— —"

তাঁহার কথায় বাধা দিয়া নিধিরাম বলিল, "না গোপী-বাবু, সে হবে না; তা' তোমাকে কিছুতেই কর্‌তে দেব না। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী থাক, আমি এই সংসারের ভার নিলাম। যে ক'রে হোক্ আমি তোমাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কর্‌ব,—এ সময় তোমাদের ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? আমাদের ত আর দাঁড়াবার স্থান নেই। তুমি ভেব না। আমি দুই-এক দিনের মধ্যেই কল্‌কাতায় যাচ্ছি। সেখানে আমাদের কত পরিচিত লোক আছে। তাদের কাউকে ধ'রে নিশ্চয়ই একটা কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌ব।"

গোপীনাথ বলিলেন, "ভাই, যখন সময় ভাল ছিল, তখন অনেক বন্ধু ছিল ; এখন কি আর কেউ সে কথা মনে কর্‌বে !"

নিধি বলিল, "দেখাই যাক্ না। তা' ব'লে ত ঘরে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। আমার কিন্তু বড় ইচ্ছা যে, একটা ব্যবসা করি। দেখি কি হয়।"

গোপীনাথ বলিলেন, "দেখ ভাই নিধি, সব কাজ করো,—কিন্তু আমার অনুরোধ, ধার ক'রে কিছু কোরো না—ধারের মত শত্রু আর নেই।"

এই কথোপকথনের দুই দিন পরেই নিধিরাম কলিকাতায় চলিয়া গেল।

জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ গেল। গোপীনাথ কোন প্রকারে সংসার চালাইতে লাগিল।

নিধিরাম কলিকাতায় কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা করিতেছে, এখনও সফল-মনোরথ হইতে পারে নাই।

ভাদ্র মাস পড়িল ; আশ্বিনের প্রথমেই এবার মহামায়ার পূজা। গোপীনাথ স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এবার পূজা করা হইবে না। মণ্ডল-বাড়ী দুর্গোৎসবে যে সমারোহ হইত, তাহা ত একেবারেই অসম্ভব,—কোন প্রকারে মায়ের পূজা কর্‌তে গেলেও যে তিন-চার শত টাকা লাগে! এত টাকা তিনি কোথায় পাইবেন? এ তিন-চার শত টাকা থাকিলে যে তিনি সপরিবারে তিন চারি মাস খাইয়া বাঁচেন! না—এবার আর মণ্ডল-বাড়ীতে মহামায়ার আগমন হইবে না।

এই সময় একদিন সন্ধ্যার পর গোপীনাথ বিষণ্ণ মনে বাহিরের বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার মাতাঠাকুরাণী সেখানে আসিয়া বলিলেন, "গোপী, বাবা, অমন করে একেলা ব'সে আছ কেন? ঘরে যে একটা আলোও কেউ দিয়ে যায় নাই,—সন্ধ্যাদীপও বুঝি দেখান হয় নাই!"

গোপীনাথ বলিলেন, "না মা, আলোর দরকার নেই, আমি এই আঁধারেই বেশ আছি।"

কথাটা মায়ের বুকে বাজিল। তিনিও যে আজ কয়দিন হইতে আঁধার দেখিতেছেন! সম্মুখে পূজা!—এতকাল মা আসিয়াছেন,—আর এ-বৎসর তাহার কোনই আয়োজন হইতেছে না,—এই কথা ভাবিয়া তিনিও কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। আজ সেই কথাটা উত্থাপন করিবার জন্যই তিনি গোপীনাথের নিকট আসিয়াছিলেন। কিন্তু গোপীনাথের কথা শুনিয়া সে প্রসঙ্গ তুলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

গোপীনাথ বুঝিলেন, মাতা কোন বিশেষ কথার জন্য আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন, "মা, এ সময় তুমি এ দিকে এলে যে?"

মা বলিলেন, "না, তুমি কি করছ, তাই দেখতে এলাম।"

গোপীনাথ বলিলেন, "মা, এবার পূজার কি হবে? আমি অনেক ভেবে দেখলাম, পূজা করা ত অসম্ভব!"

মা বলিলেন, "বাবা, সেই কথা বল্‌তেই আমি এসেছিলাম; কিন্তু এই আঁধারের মধ্যে তোমাকে চুপ করে বসে থাক্‌তে দেখে আমার আর সে কথা তুল্‌তে মন সরছিল না।"

গোপীনাথ বলিলেন, "যে রকম অবস্থা হয়েছে মা, তা ত তুমি দেখ্‌তেই পাচ্ছ, বুঝ্‌তেই পাচ্ছ; কেমন করে যে সংসার চল্‌বে, তাই প্রধান ভাবনা!"

মা বলিলেন, "তা কি আর আমি বুঝ্‌ছিনে বাবা! কিন্তু কি কর্‌বে! অদৃষ্ট মন্দ, তাই এই ছেলে-বয়সে তোমাকে এত কষ্ট পেতে হল, আর আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌ছি।"

গোপীনাথ বলিলেন, "তা হ'লে পূজা এবার বন্ধ থাকুক; আবার যদি কখন সুদিন আসে, তখন দেখা যাবে। কি বল মা?"

মাতা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "এত কালের পূজা! কর্ত্তার সঙ্গে-সঙ্গেই শেষ হ'য়ে যাবে! আর উপায়ও ত দেখ্‌ছি নে। আমার কি বৌমার যদি দু'চারখানা অলঙ্কার থাক্‌ত, তা হ'লে না হয়, তাই দিতাম; কোন রকমে এবার মাকে আনা যেত। তাও ত নেই। এক ধার-কর্জ্জ,—তা বাবা, তোমাকে করতে দিচ্ছিনে।"

গোপীনাথ বলিলেন, "মা, কোন-রকমে পূজা সার্‌তে

গেলেও তিন-চারশ' টাকার দরকার। এত টাকা কোথায় পাব।"

মা বলিলেন, "মা দুর্গা, তোর মনে এই ছিল মা! যাক্ গোপি, বাবা, তুমি আর ও-সব কথা ভেবে মন খারাপ কোরো না। তুমি বেঁচে থাক, তোমার ভয় কি? এ বছর নাই হোলো পূজা, আস্‌ছে বছর হবে। তুমি কিছু ভেব না; জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি!"

এই সময় ইন্দিরা "বাবা, বাবা" বলিয়া ডাকিতে-ডাকিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। "বাবা, তুমি এ অন্ধকারে বসে কি কর্‌ছ? আলো আন্‌ব?"

গোপীনাথ বলিলেন, "না মা, আলো এনে কাজ নেই। এই আমি মায়ের সঙ্গে দুটো কথা বল্‌ছিলাম।"

ইন্দিরা বলিল, "কৈ, দিদি কৈ? আমি যে আঁধারে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি নে।" "এই যে দিদি, আমি এই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি।"

ইন্দিরা তখন ঠাকুরমার নিকটে যাইয়া বলিল, "আলোতে বুঝি তোমাদের কথা হয় না! আঁধারের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়েও ত থাকৃতে পার! আচ্ছা বাবা, ওরা সবাই বল্‌ছিল, এবার আমাদের বাড়ী পূজো হবে না। কেন হবে না—খুব হবে। দাদামশাই নেই, দিদিমা ত আছে, বাবা ত আছে! পূজো হবে না বল্‌লেই অমনি হ'লো। বুঝলে বাবা, মা সেই কথা শুনে কাঁদছিল। আমি বল্‌লাম,

'যাই দেখি বাবার কাছে ; পূজো আবার হবে না !' পূজো কর্‌তেই হবে দিদিমা ! তুমি কারো কথা শুনো না—বাবা বল্‌লেও শুনো না। দিদিমা, তুমি যে কথা বল্‌চ না ?"

দিদিমা অতি ধীর স্বরে বলিলেন, "দিদি, কি ক'রে পূজা হবে। আমাদের যে কিছু নেই !"

ইন্দিরা বলিয়া উঠিল, "কিছু নেই কি, তুমি আছ, বাবা আছে, মা আছে, আমি আছি !"

ইন্দিরার কথা শুনিয়া গোপীনাথের যেন কি হইয়া গেল ! তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া কন্যাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "মা আমার, কিছু নেই কি ? সব আছে। তুই যখন আছিস্, তখন আমার সব আছে। মা, এবার তোর পূজা। হাঁ, পূজা হবে বৈ কি ! তুই যখন আছিস্, তুই যখন আমাকে ছেড়ে যাস্‌নি মা, তখন পূজা হবে বৈ কি ! যাও মা, তোমার মায়ের চখের জল মুছিয়ে দেও গে ! বোলো এবার পূজা হবে,—এবার আমার মা ইন্দিরার আদেশ, পূজা হবে।"

মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "মা, ভেব না ; যাঁর পূজা তিনি করবেন। শুন্‌লে না, মা-দুর্গা ইন্দিরার মুখ দিয়ে বল্‌লেন 'আমি আছি' ! ও ত ইন্দিরার কথা না, মা মহামায়া আজ কন্যারূপে এসে বল্‌ছেন 'ওরে আমি আছি !'"

ঠিক সেই সময়ে এক দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ মুসলমান ফকির

একটা বাতি হাতে করিয়া বৈঠকখানার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া জলদ্‌গম্ভীর স্বরে বলিল,—"ইয়া পীর মওলা মুস্কিল-আসান, যাঁহা মুস্কিল তাঁহা আসান।"

(৪)

পরদিন বেলা এগারটার সময় গোপীনাথ যখন স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, সেই সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "বাবু, এক-খানি পত্র আছে।"

গোপীনাথ বলিলেন, "তুমি কোথা থেকে আস্‌ছ?"

লোকটী বলিল, "কলিকাতা থেকে,—সকালের গাড়ীতে এসেছি।" এই বলিয়া সে গোপীনাথের হাতে একখানি পত্র দিল।

গোপীনাথ পত্রের শিরোনামা দেখিলেন—তাঁহার পিতার নাম লেখা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "এ চিঠি ত আমার বাবার নামে। তিনি ত চৈত্র মাসে স্বর্গে গিয়েছেন! আহা, তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ যে! ঐ বেঞ্চখানার উপর বোসো। তুমি বুঝি আর কখন বৈকুণ্ঠপুরে এস নি? আগে খবর দিলে ষ্টেসনে লোক পাঠিয়ে দিতাম।"

লোকটী সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে না, আর কখন আসি নি। তা' ইষ্টিসেন থেকে এ আর কতটুকু পথ,—কোশ

দেড়েক হবে ; আর যাকে মণ্ডল বাড়ীর নাম বলেছি, সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছে। দু-কোশ পাঁচ কোশ চল্‌তে আমাদের কষ্ট হলে কি বাবু চলে !”

গোপীনাথ তখন বলিলেন, “কে চিঠি লিখছেন ?”

লোকটী বলিল, “আমাদের বড় বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় মহাশয় ; তিনি কর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর রায় মহাশয়ের বড় ছেলে। বড়বাবু মুখে ব’লে দিয়েছেন যে, তিনি আর কর্ত্তা মহাশয় আজ দুইটার গাড়ীতে এখানে আস্‌বেন। আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, আর গাড়ীর সময় ষ্টেসনে দু’খানি পাল্‌কী ঠিক করে রাখতে ব’লে দিয়েছেন। কর্ত্তা মহাশয় বৃদ্ধ হয়েছেন, বয়স প্রায় ষাটের উপর, শরীরও ভাল নয়। তাই বড়বাবু আমাকে সব ঠিক করবার জন্য আগে পাঠিয়ে দিলেন।”

গোপীনাথ মহা চিন্তায় পড়িলেন। সর্ব্বেশ্বর রায়, সিদ্ধেশ্বর রায়,—এ কোন নামই ত তাঁহার পরিচিত নহে ! শুনিলেন সর্ব্বেশ্বর রায় বৃদ্ধ ; তিনি কষ্ট করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এতদূরে তাঁহার বাড়ীতে আসিতেছেন বেশ, গোপীনাথ মোটেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

লোকটীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতেও কেমন সঙ্কোচ বোধ হইল। যিনি এত আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে মোটেই জানেন না, এ কথা প্রকাশ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে। অথচ যাঁহারা আসিবেন, তাঁহারা কি প্রকার অবস্থার লোক, কেমন ভাবে

তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য, ইহা জানিতে না পারিলে হয় ত অনেক ত্রুটী হইতে পারে।

তখন তিনি মনে করিলেন, এই লোকটীর নিকট হইতে কৌশলে সমস্ত কথা জেনে নিতে হ'বে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

লোকটি বলিল, "আমার নাম শ্রীরজনীকান্ত দাস। আমি রায়-বাবুদের চাকর। যখন যেখানে চিঠিপত্র নিয়ে যেতে হয়, কি সঙ্গে যেতে হয়, তাই আমি করি। কর্ত্তা, বড় বাবু, ছোট বাবু সকলেই আমাকে কৃপা করেন।"

"তুমি কত বেতন পাও ?"

"আজ্ঞে সামান্য মাহিনা পাই, আর খেতে পাই। মফস্বলে চিঠিপত্র নিয়ে গেলে কিছু-কিছু পাই; তার পর বিপদ-আপদে কর্ত্তাই আছেন। এই ত কর্ত্তা কাশীবাস করতে যাবেন; তা আমাকে বলেছেন, 'রজনী, তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।' কর্ত্তার ত কাশী যাওয়ার সব ঠিক; এই দু'চার দিনের মধ্যেই যাবেন; বাঁধা-ছাঁদা সব হচ্ছে। সেখানে বাড়ী পর্য্যন্ত কেনা হয়েছে। তার মধ্যে কি না; আজ খুব ভোরে উঠে বড় বাবু আমায় ডেকে বল্লেন, 'দেখ রজনী, তোকে এখনই বৈকুণ্ঠপুর যেতে হবে,—এই সাতটার গাড়ীতে।' তার পর পথ-ঘাটের কথা বলে দিলেন। কর্ত্তা বুড়ো মানুষ, কোথাও যান না; এই যে কাজ-কর্ম্ম, বিষয়-আশয়, এত বড় কল্‌কাতার আড়ত,—সব, বড় বাবু দেখেন-

শোনেন। কর্ত্তা একেবারে কাশীবাসী হতে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে আজ সকালে হুকুম হোলো তাঁরা এখানে আপনার বাড়ীতে আসবেন। বড়মানুষের মরজি—কখন কি হয় তা ত বলা যায় না। পত্রখানি পড়ে দেখুন, তাতে বোধ হয় সব কথা খোলসা লেখা আছে।”

গোপীনাথ তখন পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন; তাহাতে লেখা আছে—

শ্রীশ্রীহরি

সহায়।

সবিনয় নিবেদন,—

আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত সর্ব্বেশ্বর রায় মহাশয় কোন বিশেষ কারণে অদ্য অপরাহ্নের গাড়ীতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন। তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, শরীরও তেমন ভাল নহে; এই জন্য আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব। ষ্টেসন হইতে আপনার বাড়ীতে গমনের, এবং আগামী কল্য প্রত্যাগমনের ব্যবস্থা করিবার জন্য রজনী দাসকে এই পত্রসহ পাঠাইলাম। সবিশেষ সাক্ষাতে নিবেদন করিব। অত্র কুশল, মহাশয়ের পারিবারিক কুশল কামনা করি। নিবেদন ইতি—

ভবদীয়

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নাই; অথচ যে বৃদ্ধ কাশী গমন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি হঠাৎ পুত্র সঙ্গে করিয়া বৈকুণ্ঠপুরে আসিতেছেন, ইহার কোন কারণ গোপীনাথ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তিনি রজনী দাসকে বলিলেন, "তা হ'লে দাসের পো, বেলা অনেক হয়েছে; স্নান-আহার ক'রে বিশ্রাম কর। তাঁদের ষ্টেসন থেকে আন্‌বার সমস্ত ব্যবস্থা আমিই ঠিক্ করে রাখব; তার জন্য তোমাকে কষ্ট করতে হবে না।"

এই বলিয়া তিনি রজনীকে চাকরের জিম্মা করিয়া দিয়া নিজে স্নান-আহারে গমন করিলেন।

আজ আর তাঁহার বিশ্রাম করিবার সময় নাই। পূর্ব্বের মত অবস্থা থাকিলে দু'দশজন বড়মানুষের অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইতে হইত না। কিন্তু এখন ত আর সে অবস্থা নাই! সুতরাং সবই নিজেকে দেখিয়া-শুনিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। আর্থিক অবস্থা যাহাই হউক, পিতৃ-পিতামহের নাম ত এখনও লোপ পায় নাই। বিশেষতঃ, রজনীর নিকট যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিতে পারিলেন, যাঁহারা আসিতেছেন, তাঁহারা অবস্থাপন্ন লোক, কলিকাতার অধিবাসী; তাঁহাদের পদমর্য্যাদার অনুরূপ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তাই আহারান্তেই তিনি লোকজন ডাকাইয়া বৈঠকখানার আবর্জ্জনা দূর করিলেন; ফরাস পাতাইলেন; বিক্রয়াবশিষ্ট যে কয়েকটী আলো ছিল, তাহা যথাস্থানে

স্থাপিত করিলেন। অবস্থা মলিন হইলেও, এখনও ডাকিলে দশজন লোক মণ্ডল-বাড়ীতে আসে, এবং কাজটা-কর্ম্মটা করিয়া দেয়।

এই প্রকারের দুই-চারিজন অনুগত লোককে ডাকাইয়া বাড়ী-ঘর একটু পরিষ্কার করাইয়া লইলেন। পুকুর হইতে মাছ ধরাইবার ব্যবস্থা করিলেন; আহার্য্য দ্রব্যও যথাসাধ্য সংগ্রহ করিলেন।

তাহার পর ভাবিলেন, ভদ্রলোকেরা যখন পূর্ব্বাহ্ণে সংবাদ দিয়াছেন, তখন ষ্টেসনে কেবল পাল্কী ও লোক পাঠাইয়া দেওয়া ভাল দেখায় না।—অপরিচিত বড়লোক, কলিকাতার বাবু লোক,—হয় ত তাহা অভ্যর্থনার ক্রটী বলিয়া মনে করিতে পারেন; তাই তিনি তিনখানি পাল্কীর ব্যবস্থা করিলেন। নিজেদের যে কয়খানি পাল্কী ও যে দুইটা ঘোড়া ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বেই বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন,—বিলাসিতার যাহা কিছু আস্বাব, সে সমস্তই বিদায় করিয়াছিলেন।

এই সকল ব্যবস্থা করিতে করিতেই বেলা চারিটা বাজিয়া গেল; তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া পাল্কীতে চড়িয়া ষ্টেসনে গেলেন—অপর দুইখানি পাল্কী পূর্ব্বেই রজনী দাসকে সঙ্গে দিয়ে ষ্টেসনে পাঠাইয়াছিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেসনে আসিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী কক্ষ হইতে একটী বৃদ্ধ ও একটী যুবক অবতরণ করিলেন।

গোপীনাথ সেই দিকে অগ্রসর হইলে রজনী কর্ত্তাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "কর্ত্তা মহাশয়, বাবু আপনাদের নিতে নিজেই এসেছেন।"

তখন গোপীনাথ তাঁহার সম্মুখে যাইয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, "আমার নাম শ্রীগোপীনাথ মণ্ডল; আমি স্বর্গীয় হরেকৃষ্ণ মণ্ডল মহাশয়ের পুত্র।" বৃদ্ধ সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "এস বাবা, বেঁচে থাক। তোমার বাবা বেঁচে নেই। আমি সে খবর জানিনে, তিনি আর আমি এক বয়সী ছিলাম; আমিই হয় ত একটু বড় ছিলাম। হরেকৃষ্ণ আমাকে 'সর্ব্ব-দা' ব'লে ডাকৃত। সে কি আজকের কথা বাবা! এখন চল, তোমার বাড়ী যাই। আজ বড় আশা করে এসেছিলাম, হরেকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হবে; সে দেখ্‌ছি আগেই চলে গিয়েছে। তোমাদের বাড়ী এখান থেকে কত দূর বাবা?"

"এই ক্রোশ দেড়েক; আমি পাল্কীর ব্যবস্থা করেছি।"

সর্ব্বেশ্বর বাবু সিদ্ধেশ্বর বাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, "এইটী আমার বড় ছেলে, সিদ্ধেশ্বর।" গোপীনাথ সিদ্ধেশ্বর বাবুকে নমস্কার করিলেন। তাহার পর সকলে ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া পাল্কীতে চড়িলেন। সর্ব্বেশ্বর বাবুর সঙ্গে যে তুইজন চাকর ও একজন দ্বারবান আসিয়াছিল, তাহারা রজনী দাসের সঙ্গে পদব্রজে চলিল।

(৫)

বাড়ীতে পৌঁছিয়া বিশ্রামান্তে হাত-মুখ ধুইয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু যখন ফরাসে বসিতে যাইবেন, তখন গোপীনাথ বলিলেন, "একটু জলযোগ করতে হবে। আমাদের এ পাড়াগাঁ, এখানে ত আপনার অভ্যর্থনার উপযুক্ত কিছুই মেলে না; তবে যখন দয়া করে পায়ের ধূলো—"

গোপীনাথের কথায় বাধা দিয়া, তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "বাবা, তুমি জান না, তোমাদের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ। তা জানলে এমন কথা বল্‌তে না। যাক্, এখন চল, একটু জল খেয়েই আসি।"

এই বলিয়া সিদ্ধেশ্বর বাবু ও গোপীনাথকে সঙ্গে লইয়া তিনি অন্দরের একটা ঘরে গেলেন।

সেখানে দেখেন, তাঁহাদের পিতা-পুত্রের জন্য প্রচুর জলযোগের আয়োজন হইয়াছে।

সর্ব্বেশ্বর বাবু তখন গোপীনাথকে বলিলেন, "বাবা গোপীনাথ, এ তুমি কি করেছ? আমাকে তোমরা কি মনে করেছ? তুমি তা' হলে কিছুই জান না। আমি যে এ বাড়ীর চাকর।"

এই বলিয়া তিনি মৃত্তিকা-আসনে বসিয়া পড়িলেন। গোপীনাথ ও সিদ্ধেশ্বর বাবু অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "তোমরা আমার কথা বুঝ্‌তে

পার্‌ছ না; আমি সত্য-সত্যই এ বাড়ীর চাকর—সামান্য চাকর—এক টাকা বেতনের চাকর। আমার জন্য এ অভ্যর্থনার আয়োজন ক'রে গোপী, তোমার পিতামহের অপমান কোরো না। তোমরা বোসো, আমার কথা শোন।"

গোপীনাথ বলিলেন, "আপনি ঐ আসনের উপর ব'সে যা বল্‌বার বলুন না।"

সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, "না, না,—আগে আমার কথা শোন। এ কথা তুমি নিশ্চয়ই শুনেছ যে, তোমার পিতামহ স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ মণ্ডল মহাশয় মুর্শিদাবাদ জেলার হাজিপুরের নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। তিনি যে বছর কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী চলে আসেন, তার দুই বছর আগে আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তখন আমার কেউ ছিল না—আমি নিরাশ্রয় ছিলাম;—ভিক্ষা করে খেতে-খেতে হাজিপুরে যাই। তখন আমার বয়স বার কি তের বছর; তোমার বাবারও বয়স তখন দশ-এগার। মণ্ডল মহাশয় আমার দুরবস্থা দেখে দয়া করে আমাকে আশ্রয় দেন; আমি তাঁর চাকর হয়ে থাকি। তিনি আমাকে মাসে এক টাকা বেতন দিতেন, আর খেতে-পরতে দিতেন। আমি তখন অতি সামান্য লেখাপড়া জান্‌তাম। দুই বছর তাঁর কাছে থাকি। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাস্‌তেন। আমি তিলির ছেলে; তাই তিনি আমাকে দিয়ে সামান্য চাকরের কাজ

করাতেন না ; আমি হাটবাজার কর্‌তাম, তোমার বাবার সঙ্গে-সঙ্গে থাকৃতাম। তার পর তিনি যখন কর্ম্ম ত্যাগ করে দেশে আসেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে এখানে আস্‌তে চেয়েছিলাম। তিনি তাতে সম্মত হন নাই। তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'দেখ সর্ব্ব, তোমার ভাল হবে, তোমার উন্নতি হবে, তোমার এ অবস্থা থাকৃবে না।' তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমি তিলির ছেলে, চাকরের কাজ আমার নয়। এই ব'লে তিনি আমাকে পঞ্চাশটী টাকা দিয়ে বলেছিলেন, 'সর্ব্ব, এই টাকা কয়টী দিয়ে একখানা দোকান কোরো, আর কারো চাকৃরী কোরো না। আমি তোমাকে এই মূলধন দিয়ে গেলাম। সৎপথে থেকে কাজ কোরো, তোমার উন্নতি হবে।' আমি সেই মহাপুরুষের উপদেশ গুরুবাক্য ব'লে গ্রহণ করেছিলাম। তারই থেকে আজ আমার এই অবস্থা। তাঁরই আশীর্ব্বাদে আজ আমার জমীদারী ; তাঁরই আশীর্ব্বাদে আজ আমি সর্ব্বেশ্বর রায় ;—তাঁরই মূলধনে আজ আমি ধনী। তিনি আজ স্বর্গে, তাঁর ছেলে হরেকৃষ্ণ আজ স্বর্গে ; আমি কি তাঁর বাড়ীতে এসে আসনে বসে জলযোগ কর্‌তে পারি! অমন কথা বোলো না গোপীনাথ! আমি কত আশা করে এসেছিলাম—হরেকৃষ্ণ তার ছেলেবেলার সঙ্গী সর্ব্ব-দাকে দেখে কত আনন্দ কর্‌বে। আর—যাক্, সে কথায় আর এখন কাজ নেই। বাবা গোপীনাথ, তুমি তোমার

মাকে ডাক; তিনি এসে হাতে তুলে আমাকে কিছু দেন; আজ চল্লিশ বছর পরে আমার মনিব-বাড়ীর প্রসাদ পেয়ে আমরা বাপ-বেটায় কৃতার্থ হয়ে যাই। শোন গোপীনাথ, তুমিও শোন সিদ্ধেশ্বর, সেই ছেলেবেলায়,—সেই যখন আমরা হাজিপুরে ছিলাম, তখন হরেকৃষ্ণ আমাকে 'সর্ব্ব-দা' ব'লে ডাকৃত। তার পর আমি সে ডাক ভুলে গিয়েছিলাম। এই চল্লিশ বৎসর কেউ আমাকে 'সর্ব্ব-দা' বলে ডাকে নাই। আমি মহা অপরাধী; চল্লিশ বছর তোমাদের কথা ভুলে ছিলাম—একেবারে ভুলে ছিলাম। কাল রাত্রিতে একটা মেয়ে—স্বপনে নয় বাবা—আমি তখন বেশ জেগে ছিলাম—আমি সজ্ঞানে ছিলাম—তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা কি আটটা—একটা ছোট মেয়ে, এই চল্লিশ বছর পরে আমার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে বল্‌লে, 'সর্ব্ব দা, কাশী যাচ্ছ; বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের ধার কি শোধ কর্‌বে না,—তাদের যে বড় কষ্ট; তাদের বাড়ী এবার পুজো যে হয় না!' দেখ, আজ চল্লিশ বছর 'সর্ব্ব-দা' ব'লে কেউ ত আমায় ডাকে নাই। কাল কে সে মেয়ে, আমাকে সেই নাম ধ'রে ডাক্‌লে! স্বপ্ন নয় বাবা,—কিছুতেই স্বপ্ন নয়! আমার মত মহা অপরাধীকে অপরাধের কথা জানিয়ে দেবার জন্য কে আমাকে দয়া করেছিলেন? সেই জন্যই আজ চল্লিশ বছর পরে তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি। আমার সবই ত তোমাদের গোপীনাথ! তাই আমি তোমাদের কাছে এসে

দাঁড়িয়েছি;—বৈকুণ্ঠ মণ্ডলের চাকর আজ তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তোমার মাকে হুকুম কর্‌তে বল বাবা! আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হোক।”

গোপীনাথ অশ্রুপূর্ণনয়নে বৃদ্ধ সর্ব্বেশ্বর বাবুর হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “আপনি না হয় ঠাকুরদাদার চাকর ছিলেন; কিন্তু আমার বাবার ত ‘সর্ব্ব-দা’! আমার ত জ্যেঠামশাই! আমি যে আজ বাপ হারিয়ে জ্যেঠামশাইকে পেয়েছি! আপনি সেকালের চাকর হতে পারেন; আজ যে আপনি আমার জ্যেঠামশাই! এই সম্পর্কই আজ ধরুন। আমি বিপন্ন, আমার বিষয়-আশয় সব বেচে আমি বাবার ঋণ শোধ করেছি; তাই আজ আমি দরিদ্র, তাই আজ আমি আমার জ্যেঠামশাইকে—”

গোপীনাথের কথায় বাধা দিয়া সর্ব্বেশ্বর বাবু বলিলেন, “তাই আজ জ্যেঠামশাই তাঁর ঋণের সামান্য অংশ শোধ দিতে এসেছে।”

গোপীনাথ বলিলেন, “জ্যেঠামশাই, আমার কথা ত আপনি শুন্‌বেন না; তা হ’লে যে আপনাকে ‘সর্ব্ব-দা’ ব’লে ডেকে জোর ক’রে হাত ধ’রে নিয়ে বসাতে পারে, তাকেই ডাকি।”

“সে কে বাবা গোপীনাথ!”

“সে আমার মেয়ে ইন্দিরা।”

এই কথা বলিয়া গোপীনাথ ডাকিলেন, “মা ইন্দিরা,

এদিকে এস মা! দেখে যাও তোমার আর এক দাদামশাই এসেছেন।"

ইন্দিরা, তাহার মা, তাহার ঠাকুরমা এবং বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা সকলেই পাশের ঘর হইতে সমস্ত শুনিতেছিলেন।

পিতার আহ্বান শুনিয়া ইন্দিরা ধীরে ধীরে আসিয়া গোপীনাথের পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সর্ব্বেশ্বর বাবু মুখ তুলিয়া চাহিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি বল্‌ছ! এই তোমার মেয়ে ইন্দিরা!"

তাহার পরই বৃদ্ধ দৌড়িয়া গিয়া ইন্দিরাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "দিদি! সর্ব্ব দার অপরাধ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য তুই-ই না কা'ল আমার কাছে গিয়েছিলি! গোপীনাথ! সিদ্ধেশ্বর! এই ইন্দিরাই কা'ল আমার কাছে গিয়েছিল! আমাকে 'সর্ব্ব-দা' বলে ডেকে আমার ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এসেছিল! মা মহামায়া! তুমি কা'ল আমার এই দিদির রূপ ধরে মণ্ডল-বাড়ীর পূজা আদায় কর্‌তে গিয়েছিলে মা! বুড়া সর্ব্বেশ্বরের উপর তোমার এত করুণা—মা করুণাময়ী! আয় দিদি! আয় আমার মহামায়া! আয়—"

বৃদ্ধ সর্ব্বেশ্বর রায় সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন।

কত দূর !

আমাদের এম-এ পরীক্ষা যে দিন শেষ হইয়া গেল, তাহার পরদিনই বাড়ী গেলাম। আমাদের বাড়ী মেদিনীপুরে।

রাত্রি নয়টার সময় বাড়ীতে পৌঁছিয়াই প্রথমে বাবাকে দেখিলাম। তিনি বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—আমি যে তাঁহার এক মাত্র সন্তান !

বাবাকে প্রণাম করিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীর ভাল আছে ত ?"

আমি বলিলাম, "ভালই আছি।"

মিথ্যা কথা ! শরীর তখন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন লিখ্‌লি ?"

আমি বলিলাম "ভালই লিখেছি !"

"ফার্ষ্ট ক্লাস হবে ত !„

"আমার ত খুব বিশ্বাস, হবে।"

বাবা বড়ই আনন্দিত হইলেন ; বলিলেন, "যাও, বাড়ীর মধ্যে যাও।"

নিকটেই দুই-চারিজন মক্কেল দাঁড়াইয়া ছিল; তাহারা বলিল "আপনারই ত ছেলে—পাশ আবার হবে না।"

বাবা উকিল, এম-এ, বি-এল; সুতরাং তাঁহার যখন ছেলে আমি, তখন, তাঁহার মক্কেলদিগের আইন অনুসারে আমি পৈত্রিক উপাধির উত্তরাধিকার পাইতে হকৃদার! কেমন!

বাড়ীর মধ্যে যাইতেই মা, মাসীমা, রমা (মাসীমার বিধবা মেয়ে) প্রভৃতি আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ধরিল। যাঁহারা প্রণাম পাইবার অধিকারী, তাঁহারা প্রণাম পাইলেন; আবার আমার ভাগ্যেও কয়েকটা প্রণাম জুটিল; কিন্তু সর্ব্বপ্রধান প্রণামটা তখনও মুলতবী রহিল।

মা আমার মাথায় হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিলেন, "আহা, বাছার আমার শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেছে—একেবারে চেনা যায় না গো!"

মাসীমা বলিলেন, "ঐ ছাই পাশের জন্য কি এমন করে শরীর মাটী করতে হয়। আজও ত চারমাস হয় নি; তখন ত বেশ শরীর ছিল। এই চার মাসে এমন হয়ে গেল!"

রমা বলিল "এম-এ পরীক্ষা সব চেয়ে বড় পরীক্ষা। বউদিদি সে দিন বল্‌ছিল, রাতদিন না পড়লে কেউ ও-পরীক্ষায় পাশ দিতে পারে না। এত খাটুনীতে কি শরীর থাকে? পাশ—না—মানুষ-মারা কল!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "রমা ঠিক বলেছিস্—ও মানুষ-মারা কলই বটে। ও কলে পড়লে আর কিছুই থাকে না।"

মাসীমা বলিলেন, "সে সব এখন থাক্, মহিন্দির! তুই কাপড় ছেড়ে, হাত মুখ ধুয়ে, ঠাণ্ডা হ; তার পর পাশ-ফাশের কথা হবে।"

রমা বলিল, "দাদা তোমার ঘরে গিয়ে কাপড় ছার গে।"

আমি বলিলাম, "আমি আর সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে যেতে পারছিনে দিদি! তুই আমার এই কাপড়গুলো নে; দেখিস্, ঘড়িটা যেন পড়ে না যায়। মা, আমার এই ব্যাগটা ধর ত!"

এই বলিয়া মায়ের হাতে আমার মনিব্যাগটা দিতেই তিনি রমাকে বলিলেন, "রমা, এই ব্যাগটা নিয়ে বউমার কাছে দে গিয়ে। এতে বুঝি বেশী টাকাকড়ি আছে; ভাল ক'রে তুলে রাখ্তে বলিস্।"

আমি বলিলাম "মা, এ ত আমার রোজগারের টাকা নয় যে, তার ব্যবস্থা করছো—এ যে বাবার দেওয়া টাকা। এতে তোমার আর আমার অধিকার!"

মা হাসিয়া বলিলেন, "তোর সব তাতেই ঐ এক কথা। এখন থেকে সব জিনিস আগ্‌লে রাখতে না শেখালে কি হয়? আর তুই যে ছেলে!"

আমি বলিলাম, "তোমার কোলেই ত এত বড় হয়েছি মা! বাকী কটা দিনও তুমিই আগ্‌লে রেখো।"

"ষাট্, ষাট্, অমন কথা বলতে নেই মহিন্দির!" এই বলিয়া মা আমার গায়ে হাত দিয়াই বলিলেন, "তোর গা যে গরম বোধ হচ্চে রে! জ্বর হয়েছে না কি! দেখি, মাথাটা দেখি। দিদি! তুমি ত হাত দেখ্‌তে জান—ওর নাড়ীটা দেখ ত!"

আমি বলিলাম, "পাগল আর কি! জ্বর হতে যাবে কেন? গাড়ীতে এতটা পথ এসেছি, তাইতে হয় ত ও-রকম বোধ হচ্চে। তোমাদের আর ব্যস্ত হ'তে হবে না।"

এই বলিয়া আমি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলাম; কারণ তখন যদি কেহ আমার শরীরের তাপ পরীক্ষা করিত, তা হইলে দেখিত যে, আমার তখন জ্বর ১০৩ ডিগ্রী।

আজ বলিয়া নহে—একমাস হইতেই আমার রোজ একটু-একটু জ্বর হইতেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ত আমার জ্বরের ধার ধারে না; পরীক্ষকেরাও আমার জ্বরের সংবাদ পাইলে দশ নম্বর বেশী দিবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ম্মম চক্রের কঠিন পেষণে সব নিষ্পেষিত হইয়া যায়। আমার কি শুধু জ্বরই হয়—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্রের বিনিময়ে যাহা-যাহা দিতে হয়, সবই আমি ধীরে-ধীরে এই ছয় বৎসরে দিয়াছি; দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে, হৃদ্‌স্পন্দন বাড়িয়াছে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইয়াছে, প্রতিদিন শরীর ক্ষয় হইতেছে দু'পা

চলিতে হাঁফ ধরে। তবুও পরীক্ষা দিতেই হইবে—তবুও ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হইতেই হইবে! বাবার সাধ পূর্ণ করিতেই হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসরই এই প্রকারে অসংখ্য নিরীহ জীবের হত্যা-সাধন করিয়া থাকেন,—পশুক্লেশ নিবারণী সভার সভ্যেরা এখানে দৃষ্টিহীন!

একটু পরেই বৃদ্ধ ভৃত্য নবীন-দা আসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, বাড়ীর ভিতর যাও গো! মা ডাক্‌ছেন।"

আমি বাড়ীর মধ্যে গেলে মা বলিলেন, "রাত্রিরে ত আর কিছু খেলিনে; এখন ওপরে যা'। একটু চা খেতে চেয়েছিলি, সে সব তোর ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি। যখন খেতে ইচ্ছে হবে, বৌমাকে বলিস্, তৈরী করে দেবে; আর না হয় আমাকে ডাকিস্। রাত হয়েছে, ঘরে যা।"

আমি উপরে আমার ঘরে গেলাম। একবার ইচ্ছা হইল, মোহিনীর না আসা পর্য্যন্ত একখানি চেয়ারে বসিয়া থাকি; কিন্তু শরীর বড়ই অসুস্থ বোধ হইতেছিল; বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

দশ মিনিট পরেই মোহিনী ঘরে আসিল এবং তাড়াতাড়ি আমার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিয়াই বলিল, "তোমার পা যে বড় ঠাণ্ডা। দেখি—বলিয়াই আমার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "ওগো, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে! কখন জ্বর হয়েছে? খুব জ্বর যে! থারমমিটারটা আনি দেখি। মাকে ডাকব?"

আমি তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? কিছু করতে হবে না। ম্লেলে এসেছি জন্য শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে; তাই অমন বোধ হচ্চে।"

"না, না, সে কিছুতেই নয়। এ ম্লেলে আসার গরম নয়। এ জ্বর! তুমি লুকোচ্চো কেন? রোজই বুঝি এমনি জ্বর হোতো? শরীর যে কি হয়ে গিয়েছে, দেখ দেখি! শরীর যখন খারাপ বুঝলে, তখন এবার একজামিন্ না দিলেই পারতে; আসছে বছরে দিলেই হোতো।"

আমি বলিলাম "ও সব কিছু নয়। রোজ রোজ সামান্য একটু জ্বর হোতো। এখন বাড়ী এসেছি, সব সেরে যাবে।"

মোহিনী আমার গায়ে হাত বুলাইতে-বুলাইতে বলিল, "সেরে যাবে বই কি; তবে এতদিন যে কষ্ট পেলে। কা'ল থেকে নিয়ম-মত থাক, আর ওষুদ খাও। তা হলেই শরীর সুস্থ হবে। আমি বলি কি, দাদাকে চিঠি লিখে দিই। তিনি এসে ব্যবস্থা করে দিয়ে যান।"

আমি বলিলাম, "কেন তাঁকে কষ্ট দেবে। এখানেও ত ভাল ডাক্তার আছে।"

মোহিনী বলিল "না, না, তা হবে না। দাদার মত ডাক্তার ত আর এখানে নেই। তিনিই একবার এসে দেখে যান; তা' হলেই আমি নিশ্চিন্ত হব। তা' সে কথা যাক্। এসে অবধি ত জলটুকুও খাওনি; এখন একটু চা

তৈরী ক'রে দিই। দুধ, চিনি, ষ্টোভ,—মা সব রেখে গেছেন; রুটী-মাখনও রেখে গেছেন। রুটী টোষ্ট করে দিই, আর একটু চা তৈরী করে দিই। তাই খেয়ে ঘুমোও। রাত প্রায় দশটা বাজে।"

আমি বলিলাম, "ও সব কিছু কাজ নেই। শেষে হাত পুড়িয়ে ফেল, কি একটা অগ্নিকাণ্ড হোক্। তার চাইতে তুমি আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও, তা হলেই আমার শরীর জুড়িয়ে যাবে। টোষ্ট তুমি পেরে উঠ্‌বে না।"

মোহিনী বলিল, "সে কথা আর বল্‌তে হবে না। আমি বেশ রাঁধতে শিখেছি। আগে জান্‌তাম না তাই। শুন্‌বে তবে; সেদিন বাবা আটদশজন বাবুকে নিমন্ত্রণ করে-ছিলেন। তাঁরা ব'লে দিয়েছিলেন, বামুণ-ঠাকুরের রান্না খাবেন না। মা রান্না করেছিলেন; আমি মাংস রেঁধেছিলাম —হ্যাঁ গো, আমি নিজে হাতে রেঁধেছিলাম। সবাই খেয়ে কি বলেছিলেন জান—এমন মাংস রান্না তাঁরা কখন খান্‌নি। বাবা বাড়ীর মধ্যে এসে মাকে বল্লেন 'ওগো, বৌমা রান্নায় এম-এ পাশ, এমন মাংস রান্না কেউ কখন খায়নি।' শুন্‌লে—একেবারে এম-এ পাশ—তোমার আগেই আমি পাশ হয়ে গেছি। কেমন মশাই, আর আমি কি না রুটীখানি টোষ্ট করতে হাত পুড়িয়ে ফেল্‌ব—লঙ্কাকাণ্ড করব।"

যাক্, এতক্ষণে মোহিনী স্বরূপে আসিয়াছে। সে

দিনরাত হাসি-তামাসা, আমোদ-আনন্দেই মত্ত থাকে। আজ প্রথম দর্শনে, আমার জ্বর দেখিয়াই সে যেন কেমন গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল; কেমন ধীরে-ধীরে প্রবীণা গৃহিণীর মত কথা বলিতেছিল। এখন সে ভাব কাটিয়া গেল। আমি বলিলাম, "তা' হ'লে তোমার যা ইচ্ছা, তাই তৈরী কর।"

মোহিনী বলিল, "পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব হয়ে যাবে। তার পর তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেব। কেমন? আর যদি ভয় হয়, তা হলে খানিকটা জল নিয়ে আমার কাছে বসে থাকবে এস, লঙ্কাকাণ্ডের মত দেখ্‌লেই অমনি জল ঢেলে দেবে।" বলিয়াই হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িল—আমার যে জ্বর, তাহা ভুলিয়া গেল। আমার শরীরে কে যেন অমৃত ঢালিয়া দিল।

(২)

এতদিনের অত্যাচারে যে জ্বর হইয়াছে, তাহা কি শীঘ্র সারে? ডাক্তারের চেষ্টার ত্রুটী নাই। আমার কুটুম্বোত্তম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার ঘোষ আসিয়া যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। কিন্তু শরীর আর সুস্থ হয় না। দুই দিন ভাল থাকি, আবার জ্বর আসে, আবার দুর্ব্বল হইয়া পড়ি। বাবা-মা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ করিয়া কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসা

আরম্ভ করিলেন। কিছুতেই কিছু হয় না,—সেই একটু জ্বর ছাড়িতে চাহে না।

তখন সকলেই বলিলেন, বায়ু পরিবর্ত্তন ব্যতীত শরীর সুস্থ হইবে না—ঔষধে কোন কার্য্য করিবে না।

তখন নানা জনে নানা স্থানের কথা বলিলেন। কেহ বলিলেন দারজিলিং, কেহ বলিলেন মধুপুর, কেহ বলিলেন পুরী। এই ভাবে ভারতবর্ষে যেখানে যত স্বাস্থ্যকর স্থান আছে, সকলগুলিরই নাম হইল। যিনি যেখানে যাইয়া ফল পাইয়াছেন, তিনি সেই স্থানেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এত পরামর্শের মধ্যে পড়িয়া বাবা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এতদিনের মধ্যে কিন্তু কেহই আমার মত জিজ্ঞাসা করেন নাই—প্রয়োজনই বোধ করেন নাই। রোগীর আবার মতামত কি?

অবশেষে বাবা একদিন আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা মহেন্দ্র, এক-এক জন ত এক-এক স্থানের কথা বলেন। তোমার কি ইচ্ছা বল ত।"

আমি বলিলাম, "কোন পাহাড় যায়গায় যেতে আমার ইচ্ছা করে।"

বাবা বলিলেন, "বেশ ত। তা' হলে দারজিলিং, কার্সিয়ং, শিলং—এই তিন যায়গার এক স্থানে যাও না।"

আমি বলিলাম, "এ সব ত আমি পূর্ব্বেও দেখেছি। যদি

যেতে হয়, তা হলে একটা নূতন স্থানে গেলে বেশ হয়।”

বাবা বলিলেন, “নূতন স্থান কোথায় বল ?”

আমি বলিলাম, “নাইনিতাল গেলে হয় না ?”

বাবা বলিলেন, “বেশ ত। নাইনিতালে আমার এক বন্ধু আছেন; তাঁকে চিঠি লিখে দিই। তিনি একটা বাসা ঠিক করে পত্র লিখলে সেখানেই যেয়ো। কিন্তু বড় দূর ব'লে হয় ত বাড়ীতে আপত্তি হতে পারে। তা, তোমার যখন নাইনিতালে যেতে ইচ্ছে হয়েছে, তখন সেখানে যাওয়াই ভাল। আমি আজই চিঠি লিখে দিচ্চি।”

হঠাৎ নাইনিতালের কথা কেন বলিলাম, তাহা আমিই জানি না। বোধ হয় ঐ নামটা কেহই করেন নাই বলিয়াই আমার মনে আসিয়াছিল।

সেইদিন রাত্রিতে মোহিনী ঘরে আসিয়া বলিল, “তোমার না কি নাইনিতালে যাওয়া স্থির হোলো;—কিন্তু সে যে অনেক দূর। সেখানে তোমার যাওয়া হবে না। একলা অত দূরে কি করে যাবে ?”

আমি বলিলাম, “একলা যাব কেন ? মা যাবেন, তুমি যাবে, আমি যাব।”

মোহিনী বলিল, “সে হচ্চে না মশাই! তোমাকে যে একলা যেতে হবে, সে কথা বুঝি শোননি? দেখ, এই ডাক্তার-কব্রেজগুলোর কি বুদ্ধি! আচ্ছা, তারা কি

আমাদের জন্ত মনে করে ? শুন্‌লাম, আমি তোমার সঙ্গে থাকলে না কি তোমার অসুখ সারবে না। শুনেছ কথা ! সত্যি বল্‌ছি, কথাটা শুনে অবধি আমার এমন রাগ হয়েছে, যে, আমার ইচ্ছে করছে, সকলকে খুব দশ কথা শুনিয়ে দিই। আমার বুঝি কোন জ্ঞানই নেই। রাগও হয়, আবার এদের বুদ্ধির কথা ভেবে হাসিও পায়।”

আমি বলিলাম, “মোহিনী, রাগ কোরো না। দশজনের ব্যবহার দেখেই লোকে এ সব কথা বলে। সবাই কি আর তোমার মত।”

মোহিনী বলিল, “বেশ কথা। তা হলে মাকে সেই কথা বুঝিয়ে বল না ; তা’ হলেই ত আমাদের তোমার সঙ্গে যাওয়া হয়। মা বল্‌ছিলেন যে, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তিনি তোমার সঙ্গে যাবেন।”

আমি বলিলাম, “তাতে তোমার অমত নেই ত ?”

মোহিনী বলিল, “সে কিছুতেই হবে না। তুমি রোগা শরীর নিয়ে কোন্ দূর-দেশে যাবে, আর আমি বাপের বাড়ী যাব। সে কখনো হবে না ; সে কথা আমি বলে রাখ্‌ছি। আমি তোমার সঙ্গে যাবই। মা বুড়োমানুষ, তিনি কি তোমার সব করতে পারবেন। তাঁকে মিছে কষ্ট দেওয়া হবে, অথচ তোমার কোন উপকারই হবে না।”

আমি বলিলাম, “মাকে সব কথা বল না। তিনি শুনে যা হয় ঠিক করবেন।” মোহিনী বলিল, “ছি, আমি কি

এ কথা মাকে বল্‌তে পারি ;—আমার যে লজ্জা করে। তুমি মাকে বোলো।"

"বাঃ, তোমার লজ্জা করে, আর আমার লজ্জা করে না ! আমি কিছুতেই এ কথা মাকে বল্‌তে পারব না।"

"তা, যাই বল ; আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি কিন্তু। আমাকে ফেলে যেতে পারবে না। কাছে হ'লেও বা কথা ছিল ; সে যে কত দূর।"

কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না ; আমার নাইনিতাল যাওয়ার সংবাদ পাইয়া আমার শ্বশুর মহাশয় মেদিনীপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আমার গমনের বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া বাবাকে বলিলেন, "যোগেন্দ্র বাবু, আপনি যা ব্যবস্থা করেছেন, তার চাইতে ভাল ব্যবস্থা মনে করে আমি এসেছি। নাইনিতাল অনেক দূরের পথ ; সেখানে আপনার স্ত্রীর না গেলেই ভাল হয়। অত দূরে স্ত্রীলোক সঙ্গে থাক্‌লে নানা অসুবিধা হ'তে পারে। পুরুষদের এক কথা,—আর স্ত্রীলোক সঙ্গে থাক্‌লে সর্ব্বদাই নানা চিন্তা, নানা ভাবনা। আমি বলি কি, মহেন্দ্রের সঙ্গে বিনয় যাক্। তার প্র্যাক্‌টিসের ক্ষতি হবে বটে ; কিন্তু সে ডাক্তার ; সে যদি মহেন্দ্রের সঙ্গে থাকে, তা হ'লে আমরা নির্ভাবনায় থাকব। বিনয়ের এতে আপত্তি হবে না ; বিশেষ তার শরীরও আজকাল ভাল যাচ্ছে না। মাস দুই ঘুরে এলে তারও শরীর ভাল হবে। নাইনিতাল বেশ স্থান,

খুব স্বাস্থ্যকর। আমি যখন কমিসেরিয়েটে ছিলাম, তখন দুই তিনবার নাইনিতালে গিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, আমি যা প্রস্তাব করছি, এতে আপনার স্ত্রীর অমত হবে না। তারপর মোহিনীর কথা। আস্‌বার সময় আমার স্ত্রী ব'লে দিয়েছিলেন যে, তাকে যদি আপনারা ছেড়ে দেন, তা হ'লে দিন-কয়েকের জন্য কলিকাতায় নিয়ে যাই। কিন্তু, আমি ভেবে দেখ্‌লাম যে, মহেন্দ্র নাইনিতালে যাচ্ছে; তারপর মোহিনীকেও যদি আমি কলিকাতায় নিয়ে যাই, তা হ'লে মহেন্দ্রের মায়ের বড়ই মন খারাপ হবে। কাজ নেই মোহিনীর এখন কলিকাতায় গিয়ে। মহেন্দ্র সুস্থ হয়ে ফিরে আসুক, তার পর মোহিনীকে আমি দিন-কয়েকের জন্য নিয়ে যাব। কি বলেন?"

আমার শ্বশুর মহাশয়ের কথা শুনিয়া বাবা বলিলেন, "এর চাইতে সুন্দর বন্দোবস্ত আর হ'তে পারে না। বিনয় যে তাঁর কাজকর্ম্ম ফেলে যাবে, এ কথা আমি ভাবতেও পারি নি। তার কিন্তু ভারি ক্ষতি হবে।"

আমার শ্বশুর বলিলেন, "দেখুন যোগেন্দ্র বাবু, টাকা অনেক রোজগার করতে সে পারবে; কিন্তু স্বাস্থ্যলাভ সকলের আগে। আর আপনি ত জানেন, মোহিনী আমার বড় আদরের মেয়ে—ঐ একটী বই ত নয়। বিনয় কি সতীশ ত মোহিনী বল্‌তে অজ্ঞান। তারপর আমি মেয়ে দিয়ে ছেলে পেয়েছি—মহেন্দ্রকে আমি বিনয় সতীশের

চাইতে কম আপনার বলে ভাবিনে। আর এ প্রস্তাব কি আমি করেছি; বিনয়ই নিজে আমাকে বলেছে। দেখুন, দু' মাসে না হয় বিনয় হাজার টাকাই ঘরে আন্‌ত; কিন্তু মহেন্দ্রের স্বাস্থ্য কি দুই হাজার টাকার চাইতে অনেক বেশী নয়? আর আপনার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে আমি যা দু'-পয়সা করেছি, তাতে বিনয় সতীশের রোজগারের দিকে না চাইলেও চলে। যাক্ সে কথা। আপনার ত মত হলো, এখন বেহান ঠাক্‌রুণের মতটাও ত আমাকেই করতে হবে, না আপনিই পদপল্লবমুদারমের ভারটা নেবেন।"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "আপনার যখন ও-বিদ্যেটা অভ্যস্ত, তখন আমার গৃহিণীই বা সে গৌরবে বঞ্চিত হ'ন কেন? আপনিই যান; তবে যদি শিরসি-মণ্ডনের দরকার হয়, তা হলে আমাকে ডাক্‌বেন।"

শ্বশুর মহাশয় বড় কম যান না। তিনি বলিলেন, "মেদিনীপুরের উকিলদের কি ও-ব্যবসাটাও শিখে রাখ্‌তে হয়?"

একজন ব্যতীত আর কাহারও অমত হইল না; কিন্তু সে একজন ত মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না,—তাহার মতও কেহ জিজ্ঞাসা করিল না।

সন্ধ্যার সময় মোহিনী আসিয়া আমার সম্মুখে একখানি চেয়ারে হতাশভাবে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মুখে যেন কে কালী মাখাইয়া দিয়াছে।

আমার ভয় হইল। আমি তাহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কি হয়েছে মোহিনী! তোমার মুখ অমন মলিন কেন?"

যে মোহিনী সর্ব্বদা হাসিয়া বেড়ায়, যার মুখ আমি কোন দিন বিষণ্ণ দেখি নাই, সেই মোহিনী আজ কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল, "আমাকে তোমরা নিয়ে যাবে না? আমাকে ফেলে তুমি চলে যাবে? জান, সে কত দূর! আমি তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই থাক্‌তে পারব না। এই ত তুমি এতদিন কলিকাতায় ছিলে, মধ্যে মধ্যে বাড়ী আস্‌তে; একজামিনের সময় পাঁচ ছয় মাস ত মোটেই আস্‌তে না; তখন কি আমি তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যেতে চেয়েছি? কিন্তু এবার আমার মন কেমন করছে। শুধু মনে হচ্চে আর হয় ত দেখা হবে না। এমন ত কখন হয় না! ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চল—নিয়ে চল।"

আমি বলিলাম, "সে কি করে হবে মোহিনী! তুমি অত ভাবছ কেন? এই মাসখানেক পরেই আমি ফিরে আসব। আর আমার অসুখও এমন কঠিন নয় যে আমি—"

আমার মুখ চাপিয়া ধরিয়া মোহিনী বলিল, "অমন কথা বোলো না! আমি কি তাই বল্‌ছি। তা তুমি যাই বল, আমি যাবই—তোমরা না নিয়ে গেলেও আমি যাব।"

এই বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে কত

বুঝাইলাম, কত উপদেশ দিলাম, কত আদর করিলাম; কিন্তু তাহার সেই এক কথা, "তোমরা আমাকে না নিয়ে গেলে,—কিন্তু আমি যাইবই।"

হায়, তখন কি সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলাম! যখন বুঝিলাম, তখন সে কত দূর!

(৩)

আমরা নাইনিতালে আসিয়াছি। সঙ্গে আসিয়াছেন আমার কুটুম্বোত্তম ডাক্তার বিনয় বাবু. আমাদের পুরাতন ভৃত্য নবীনদা, আর একটি রাঁধুনী ব্রাহ্মণ। এখানেও একজন চাকর নিযুক্ত করা হইয়াছে।

আমরা যে বাংলোয় আছি, তাহা সহরের বাহিরে, অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত। বাংলোর সম্মুখে যে সামান্য জমিটুকু আছে, তাহাতে বাগান। সে বাগান একেবারে ফুলে-ভরা। প্রকৃতির এমন শোভা, পর্ব্বতের এমন দৃশ্য আমি পূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই; কিন্তু কিছুতেই আমাকে যেন আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না। আমার কিছুই ভাল লাগে না,— দিন-রাত শুধু মোহিনীর মলিন মুখ মনে হইত;—সে যে কেমন করিয়া কাঁদিতে-কাঁদিতে হতাশভাবে আমাকে বিদায় দিয়াছিল, তাহাই আমার মনে হইত।

বিনয়বাবু বেশ আছেন। যতক্ষণ বাসায় থাকেন, শুধু আমার উপর বক্তৃতা, আর ঔষধ খাওয়ান, আহারের ব্যবস্থা

করা, আমাকে চোখে-চোখে রাখা। আমি বেশীক্ষণ বাহিরে থাকিলে একেবারে পর্ব্বতটা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করেন। তাঁহার জ্বালায় পড়াশুনা করিবার যো নাই, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবারও উপায় নাই। তিনি যখন বেড়াইতে যান, তখন আমাকে সঙ্গে নিতে চান না —তিনি একটানে পাঁচ-সাত মাইল ঘুরিয়া তবে বাংলোয় ফিরেন। বাহির হইবার সময়ে, দশ মিনিট ধরিয়া, তাঁহার অনুপস্থিতি সময়ে আমাকে কি কি করিতে হইবে, কোন জামাটা গায়ে দিতে হইবে, কোন্ মোজাটা পরিতে হইবে, কোন্ গাছটা পর্য্যন্ত বেড়াইতে যাইতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া যান; এবং নবীনদাকে বলিয়া যান, "নবীন-দা, দেখো, আমি যা যা বলে গেলাম, ও ষ্টুপিড যেন ঠিক তাই করে।"

আমি হাসি, আর নীরবে এই স্নেহের অত্যাচার সহ্য করি। এতে যে আনন্দ বোধ হয়—এর মধ্যে যে কি মমতা মিশ্রিত, তা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। এত স্নেহ, এত আদর সহিবে কেন?

বাড়ীর পত্র সপ্তাহে দুইখানি করিয়া ত আসেই, মাঝে মাঝে তিনচারিখানিও আসে। কলিকাতা হইতেও সর্ব্বদা পত্র আসে। মোহিনী, বলিতে গেলে, প্রায় প্রত্যহই পত্র লেখে; আর সে-সকল পত্রে শুধু ভগবানের কাছে আমার শীঘ্র বাড়ী ফিরিবার প্রার্থনা। এখানে আসিবার কথা কোন

পত্রেই থাকে না। আমিও তাহার পত্র পাইলেই উত্তর দিই।

এমনই ভাবে প্রায় কুড়ি দিন চলিয়া গেল। আমি এখন যে দুর্দ্দিনের কথা বলিব, সে দিন শনিবার। সন্ধ্যা হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বিনয়বাবু আর সে-দিন বেড়াইতে যান নাই। আটটার মধ্যেই আহার শেষ করিয়া আমরা শয়নের আয়োজন করিলাম।

বিনয়বাবুর কি সুন্দর নিদ্রা! বিছানায় পড়িবামাত্রই তিনি নিদ্রাগত হ'ন; আর সে কি যেমন-তেমন নিদ্রা—ঘরের মধ্যে বজ্রপতনেও বোধ হয় তাঁহার গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গে না। ইহাতে আমার একটু সুবিধা হইয়াছিল। তিনি নিদ্রিত হইলে আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া বাতি জ্বালিয়া এক-এক দিন পড়িতে বসিতাম। শনিবারেও তেমনি পড়িতে বসিয়াছি।

ঘরের এক কোণে একখানি চারপাইর উপর লেপে আপাদমস্তক ঢাকিয়া বিনয়বাবু নিদ্রা দিতেছেন। সেদিন আর আমার পড়ায় মন লাগিতেছিল না। বাহিরে তখন ঝড় উঠিয়াছিল,—সঙ্গে-সঙ্গে বৃষ্টি। আমি একবার দুয়ার একটু খুলিয়া দেখিলাম, কি ভয়ানক অন্ধকার, আর কি বাতাসের গর্জ্জন! গাছপালা যেন মহাতাণ্ডবে অধীর!

আমার কেমন ভয় করিতে লাগিল; দুয়ার বন্ধ করিয়া দিলাম। শয়ন করিতেও ইচ্ছা হইল না, পড়িতেও মন

লাগে না। কি করি, বসিয়া-বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম, আর বাহিরের ক্রুদ্ধ বাতাসের 'হায় হায়' শব্দ শুনিতে লাগিলাম।

টং-টং করিয়া দেওয়াল-সংলগ্ন ঘড়িতে এগারটা বাজিল। আমার মনে হইল, কে যেন দুয়ার ঠেলিতেছে। দুয়ার ত ভিতর হইতে বন্ধ। ভাবিলাম, বাতাসের বেগে দুয়ার কাঁপিতেছে। ঘরের মধ্যে আমার চেয়ারের পার্শ্বে টেবিলের উপর একটা আলো জ্বলিতেছিল।

সহসা কেমন করিয়া বলিতে পারি না, দুয়ার খুলিয়া গেল; এবং তাহার পর—তাহার পর যাহা দেখিলাম, তাহা কেমন করিয়া বলিব—কেমন করিয়া সে দৃশ্যের কথা লিখিব? দেখিলাম—দেখিলাম, একটা জ্যোতিঃ যেন দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত;—একটা জ্যোতিঃমাত্র।

আমি সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না; তাহার পর—ওগো তোমরা শোন—তাহার পর সেই জ্যোতিঃর মধ্য হইতে একটি মূর্ত্তি যেন অবয়ব গ্রহণ করিতে লাগিল। রমণী-মূর্ত্তি—যুবতী-মূর্ত্তি। হরি হরি! এ যে মোহিনী!—জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিতে মোহিনী—মোহিনী মূর্ত্তিতে নয়। মুখখানি বড়ই মলিন। আমার সংজ্ঞা লোপ হইবার উপক্রম হইল,—তখনও দৃষ্টি সেই মূর্ত্তির দিকেই নিবদ্ধ!

সহসা সেই মুখে হাসি দেখা দিল। এ যে আমার সেই

চির-পরিচিত হাসি! মোহিনী হাসিয়া বলিল, "আমি এসেছি —এই ত কত দূর!" আমি ঠিক শুনিতে পাইলাম,—সেই কণ্ঠস্বর!

তাহার পরই জ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইয়া গেল; আমার সংজ্ঞা বুঝি ফিরিয়া আসিল। আমি "মোহিনী" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তার পর কি হইল জানি না।

যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন বেলা দশটা; বিনয়বাবু ও একজন সাহেব আমার পার্শ্বে বসিয়া আছেন।

আমি চক্ষু চাহিতেই বিনয়বাবু বলিলেন, "মহেন্দ্র, ভাই আমার, এখন কেমন বোধ হচ্চে।"

আমি অতি ধীরস্বরে বলিলাম, "ভাল।"

সেইদিন অপরাহ্নকালে একটু সুস্থ হইয়া শুনিলাম, আমি না-কি কি বলিয়া চীৎকার করিয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলাম। বিনয়বাবু অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না। কি বলিব? সেই জ্যোতিঃ! সেই মূর্ত্তি!

আরও দুই দিন গেল। আমি একটু সুস্থ হইলাম। কিন্তু সেই জ্যোতিঃ—সেই মূর্ত্তি!

তৃতীয় দিনে বিনয়বাবুর একখানি পত্র আসিল; আমার কোন পত্র নাই। আমিই বিনয়বাবুকে তাঁহার পত্রখানি দিলাম।

পত্রখানির দিকে একবার চাহিয়াই, বিনয়বাবু চীৎকার

করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "কি বিনয়বাবু,.কি হয়েছে?"

বিনয়বাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ওরে মহেন্দ্র, ওরে ভাই, মোহিনী আর নেই রে ভাই! শনিবার রাত্রি এগারটার সময় মোহিনী আমাদের ছেড়ে গেছে ভাই!"

বিনয়বাবু আর বলিতে পারিলেন না। আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। কাঁদিব কেমন করিয়া—আমার যে গলা শুকাইয়া গেল! কথা বলিব কি?

শনিবার রাত্রি এগারটা! তবে ত ঠিক তাই! মোহিনী তাহার কথা রক্ষা করিয়াছে—সে ত আসিয়াছিল! —সে ত বলিয়াছিল, 'আমি এসেছি—এই ত কত দূর।' দূর ত বেশী ছিল না মোহিনী—কিন্তু আজ কত দূর!

আনন্দময়ী

(১)

গ্রামের লোকে ঠিক নাম করিত না—বলিত ঠাণ্ডা মল্লিক; নাম করিলে সেদিন না কি অদৃষ্টে অন্ন মিলিত না। যুবকেরা তাস খেলিতে বসিয়া চারিখানি কাগজের পরের খেলায় এক পক্ষে ছক্কার হাত থাকিলে প্রতিপক্ষ যদি ঠাণ্ডা মল্লিকের আসল নাম উচ্চারণ করিয়া কাগজ কয়খানি স্পর্শ করিত, তাহা হইলে জয়-নিশ্চিত পক্ষের ছক্কা ত হইতই না, কাগজ চারিখানিও উঠিয়া যাইত;—এমনই নামের গুণ ছিল।

নামটা বলিয়াই ফেলি; ঠাণ্ডা মল্লিকের প্রকৃত নাম শীতল মল্লিক। সেকালের মেয়েরা যেমন ভাসুরের নাম হরিদাস থাকিলে 'ফরিদাস' বলে, তেমনই শীতল মল্লিকও ঠাণ্ডা মল্লিক নামেই সে অঞ্চলে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মল্লিক মহাশয় জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, কিন্তু ব্যবহার ছিল একেবারে চামারের মত। দয়া, ধর্ম্ম, চক্ষুলজ্জা বলিয়া জিনিসটা তাঁহার মধ্যে মোটেই ছিল না বলিয়া সকলেই জানিত। তাঁহার কিছু অর্থ ছিল। এই অর্থই তাঁহাকে,

একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। টাকা ধার দেওয়াই তাঁহার ব্যবসায় ছিল।

মল্লিকের সংসারে এক বিধবা ভগিনী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। ভগিনীটির যদি ছেলে-মেয়ে থাকিত, তাহা হইলে মল্লিক নিশ্চয়ই তাহাকে আশ্রয় দিতেন না; নিজেই ঘর-গৃহস্থালীর কাজ করিতেন। তাঁহার স্ত্রী যখন নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তখন মল্লিকের বয়স ৪২ বৎসর। অবশ্য দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় তখনও অতীত হয় নাই; অনেকেই তাঁহাকে কন্যাদানের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু মল্লিক হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, মা-গঙ্গা যখন অপব্যয় হইতে তাঁহাকে নিষ্কৃতিদানের জন্যই তাঁহার গৃহিণীকে কোলে টানিয়া লইয়াছেন, তখন দেবীর অভিপ্রায় কি ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করা উচিত? মল্লিক কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তাঁহার নিঃসন্তান বিধবা ভগিনীকে বাড়ীতে আনিলেন।

ভগিনীটিও দরিদ্র শ্বশুরালয়ে দাসীবৃত্তি করিয়া, অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া, দেবর-পত্নীর বাক্য-যন্ত্রণা পরিপাক করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটাইতেছিল; এখন দাদার সাদর-আহ্বানে সে চলিয়া আসিল। দাদার পরিচয় সে জানিত; কিন্তু সে বিধবা,—তাহার একবেলা এক পোয়া চাউল, একটু লবণ, আর একটা কাঁচা লঙ্কার দরকার;—হাজার কৃপণ হইলেও তাহার দাদা এই সামান্য বিষয়ে

কৃপণতা করিবেন না, এ বিশ্বাস তাহার ছিল। আর হাজারও হউক, এক মায়ের পেটের ভাই ত! সেই ভাই একেলা কষ্ট পাইবে, এ কি কখন ভগিনী সহ্য করিতে পারে?

মল্লিক মহাশয় বিশেষ বিবেচনা করিয়াই ভগিনীকে বাড়ী আনিয়াছিলেন। এতদিন অর্থাৎ স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তিনি দুবেলাই আহার করিতেন। এখন ভগিনীকে বাড়ীতে আনিয়া মল্লিক বলিলেন, "দেখ্ নেত্য, তুই আমার ছোট বোন, তোকে কোলে ক'রে মানুষ করেছি। তুই একবেলা হবিষ্যি করবি, আর আমি তোর বড় ভাই, আমি দুবেলা মাছ-ভাত, এটা-ওটা-সেটা খাব, এ আমি কিছুতেই পারব না। আজ থেকে আমিও একবেলা তোর সঙ্গে হবিষ্যিই করব। ভাই-বোন কি পৃথক রে!"

মল্লিক অনেক হিসাব করিয়াই এ কথা বলিয়াছিলেন। একটী মানুষের খোরাক—হোক্ না সে বিধবা—তারও ত চা'ল ডা'ল লাগে, তেল লাগে, কিঞ্চিৎ তরিতরকারী লাগে। তা যেমন করিয়াই হোক, একটা বিধবার একবেলা খোরাক যোগাইতে হইলে এই আক্রা-গণ্ডার দিনে আড়াই টাকার কমে আর হয় না। মাসে আড়াই টাকা,—তা হ'লে বৎসরে হইল—বার-দুগুণে চব্বিশ, আর ধর বার আধে ছয়—হোল কি না ত্রিশ টাকা। একটা মানুষের জন্য বছরে তি—রি—শ টাকা? নাঃ—এত টাকা কোথায় পাব? গিন্নীর মৃত্যুর পর মাসে যা খরচ হচ্ছিল, তার এক

আধেলা বেশী ব্যয় করা যেতে পারে না।—তবে আর গিন্নী গেল কেন? শেষে অনেক হিসাব করিয়া—অনেক জমা-খরচ খতাইয়া মল্লিক ভগিনী নেত্যর সঙ্গে এক-বেলা হবিষ্যি স্থির করিলেন। মাসান্তে হিসাব করিয়া দেখিলেন —এই বন্দোবস্তে তাঁহার ১৵/১০ আনা ব্যয়-সংক্ষেপ হইয়াছে। তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া মল্লিক বলিলেন, "হবে না! হাজারও হোক কায়েতের ছেলে! হিসাবে কেউ ঠকাতে পারবে না!"

নেত্য অনেক প্রতিবাদ করিয়া, অনেক কাঁদাকাঁটি করিয়াও দাদাকে এই মহৎ সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারিল না।

দাদা রাত্রিতে কিছুই আহার করেন না দেখিয়া নেত্য একদিন আধপোয়াটাক চাল ভাজিয়া, লবণ-তৈল মাখিয়া দাদাকে খাইতে দিতে গিয়াছিল।

দাদা চাউল-ভাজা দেখিয়া একেবারে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন; উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "নেত্য, তুই কি শেষে আমাকে ফতুর করবি! আধ পোয়া চালের দাম কত জানিস্?"

দাদা এখনই কড়াক্রান্তি হিসাব আরম্ভ করিবে, বুঝিতে পারিয়া নেত্য বলিল, "দাদা, মহাপ্রাণীকে এত কষ্ট দিতে নেই; ওতে লক্ষ্মী নারাজ হ'ন।"

দাদা রাগ করিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, লক্ষ্মী,—লক্ষ্মী

রাজীই বা কবে হলেন। যা, যা, তোর সঙ্গে আর কথা-কাটাকাটি করতে পারিনে। সাবধান, আর কখনও জিনিসপত্র এমন নষ্ট করিস্‌নে। জানিস্‌, আধপো চেলের দাম একটি পয়সা ; তা'হলে হলো গিয়ে—"

"না, না, তোমাকে আর হিসাব করতে হবে না ; আমি এই নাকে-কাণে খৎ দিচ্ছি, আর যদি কখন এমন কাজ করি।" এই বলিয়া নেত্য বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

দাদা তখন কোমল স্বরে নেত্যকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ্‌ নেত্য, তোরই ভালোর জন্য বলি। আমি আর ক'দিন আছি। এখন যদি সব উড়িয়ে দিস্‌, তা'হলে আমি মরে গেলে কি করবি।"

"তখন তোমার ঐ বুকের ধন, ঐ লোহার সিন্দুক আগ্‌লে বসে থাক্‌ব। কথার শ্রী দেখ!" নেত্য আর সেখানে দাঁড়াইল না, চাল-ভাজার বাটীটা সেখানে ফেলে চ'লে গেল! "এমন না হ'লে কি আর কপালে ওর এত দুঃখ হয়।" এই বলিয়া তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। একটু পরেই বলিলেন, "যাক্‌, কাল একাদশী। মনে করেছিলাম, এবার থেকে নির্জ্জলা একাদশীই করব ; দেখ্‌ছি হতভাগী তা করতে দিল না ; কা'ল এই চালভাজা কয়টি দিয়েই একাদশী করা যাবে।"

আধ পোয়া চাউলের একটা গতি হওয়ায় ঠাণ্ডা মল্লিক

আশ্বস্ত হইয়া বাটীটা অতি সন্তর্পণে বাক্সের মধ্যে এক পার্শ্বে তুলিয়া রাখিলেন।

নিজেদের সম্বন্ধে যাই করুন, পরের দেনা-পাওনা সম্বন্ধে ঠাণ্ডা মল্লিক খুব ঠিক ; কখনও কাহারও এক পয়সা ঠকান না। যাহার নিকট যাহা পাওনা, তার একটী আধেলাও তিনি ছাড়িয়া দেন না ; আবার তাঁহার কাছে অন্যে যাহা পাইবে, তাহা কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া তিনি পরিশোধ করেন ; কোনদিন কাহারও নিকট সিকি পয়সা মাপের জন্য প্রার্থনা করেন না। সকলেই ঠাণ্ডা মল্লিককে ঘৃণা করে, নিন্দা করে ; কিন্তু টাকার দরকার পড়িলে ঐ ঠাণ্ডা মল্লিকের কাছেই যাইতে হয় এবং অতিরিক্ত সুদ স্বীকার করিয়াই টাকা ধার করিতে হয়। সকলেই বলে, ঠাণ্ডা মল্লিকের অনেক টাকা ;—কেহ অনুমান করে পঞ্চাশ হাজার, কেহ কেহ বলে ত্রিশ হাজার ; গল্প-লেখক সর্ব্বজ্ঞ হইলেও পরের ধনের কথা প্রকাশ করিবেন কেন ?

এইভাবে তের-চোদ্দ বৎসর কাটিয়া গেল ; ঠাণ্ডা মল্লিকের ধনার্জ্জন-স্পৃহা বাড়িলও না, কমিলও না ; লোকের নিন্দা, ঘৃণা, উপেক্ষা সমস্ত অম্লানবদনে হজম করিয়া ঠাণ্ডা মল্লিক তাঁহার লোহার সিন্দুক পূর্ণ করিতে লাগিলেন। বিগত বৎসর পূজার সময় একটা বিষম গোলযোগে তাঁহাকে একেবারে উলট্-পালট্ করিয়া গেল।

গ্রামের নিষ্কর্ম্মা যুবকেরা অনেক দিন হইতেই মল্লিককে

বিপন্ন করিবার জন্য নানা ফন্দী আঁটিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু মুরুব্বীদিগের ভয়ে তাহারা এতদিন কিছুই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। পূজার সময় কর্ত্তাদের অগোচরে, অতি গোপনে তাহারা এক কাজ করিয়া বসিল।

(২)

ষষ্ঠীর দিন অতি প্রত্যূষে অন্যান্য দিনের মত নেত্য যখন বাহিরের বৈঠকখানা-ঘর ঝাঁট দিতে আসিল, তখন সে সবিস্ময়ে দেখিল, বৈঠকখানার বারান্দায় একখানি অনতি-বৃহৎ দুর্গাপ্রতিমা রহিয়াছে।

এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল ; কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াই সে সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "ও দাদা, শীগ্‌গির এস, দেখে যাও, কে আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে গো !"

ঠাণ্ডা মল্লিকের তখন সবে নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে ; উঠি উঠি করিয়াও এ-পাশ ও-পাশ করিতেছিলেন, এমন সময় ভগিনীর চীৎকার শুনিয়া তিনি তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরের দিকে দৌড়াইয়া আসিলেন। দাদাকে দেখিয়াই নেত্য বলিয়া উঠিল, "এই দেখ, পোড়াকপালীর বেটারা আমাদের বারান্দায় মা-দুর্গার প্রতিমা রেখে গিয়েছে।"

"বলিস্ কি নেত্য!" বলিয়া তিনি বারান্দার নিকটে আসিয়া দেখিলেন সত্যসত্যই একখানি দুর্গাপ্রতিমা বৈঠক-খানার বারান্দায় রহিয়াছে।

তখন তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইল; যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া গ্রামের পাজী, বজ্জাত, বদমায়েস লোকদিগের উপর অজস্রধারে ব্যাকরণ-বহির্ভূত ভাষায় গালাগালি করিতে লাগিলেন।

তাঁহার চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশী স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকায় বাহিরের অঙ্গন পরিপূর্ণ হইয়া গেল; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা বলিতে লাগিলেন, "তাই ত, এ ত ভারি অন্যায় ব্যাপার। এমন কাজ কে করলে? ভদ্রলোককে এমন বিপদে ফেলা কিছুতেই উচিত হয় নাই।"

যুবকেরা বড় কেহ আসে নাই; যে দুই-একজন আসিয়াছিল, তাহারাও অতি গম্ভীরভাবে বলিল, "এ কি অন্যায়! এমন ব্যাপার ত এ গ্রামে কখন দেখি নাই।"

মল্লিক তখন আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "এ কাজ হতভাগা ছোঁড়াদের, একথা আমি তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে করে বলতে পারি। ঐ পুরুত-ঠাকুরের বাড়ী যায়ের যে সব শালারা নাটকের আড্ডা ক'রেছে, এ সেই শালাদেরই কাজ। পাজীরা মনে করেছে বাড়ীর ওপর ঠাকুর ফেলে গেলেই আমি অমনি পূজো ক'রব। শীতল মল্লিক গলায় ছুরি দিয়ে মরবে, তবু পূজো করবে না।

বেটারা এসে দেখে যাক্, এখনি তাদের ঠাকুরের কি দশা করি। নিয়ে আয় ত নেত্য, আমার লাঠিখানা।"

প্রতিবেশী বৃদ্ধ গদাধর লাহিড়ী এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মল্লিক তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "এই দেখ ত গদা কাকা, কি অত্যাচার! তুমিই এর বিচার কর!"

লাহিড়ী মহাশয় অতি ধীরস্বরে বলিলেন, "তাই ত কাজটা অত্যন্তই গর্হিত হ'য়েছে; এ রকম অত্যাচার এ গ্রামে ত পূর্ব্বে কখন দেখিনি।"

মল্লিক বলিয়া উঠিলেন, "আপনারাই ত ছোঁড়াদের আস্পর্দ্ধা দিয়ে মাথায় তুলে দিয়েছেন; এ তাদেরই কাজ। হয় আপনারা এখনি প্রতিমা সরিয়ে নিয়ে যান, তা না হয় ত আমি রাস্তায়—"

"শীতল, রাগে জ্ঞানহারা হয়ো না। যারা এ কাজ ক'রেছে—গ্রামের দশজনকে ডেকে তার অনুসন্ধান ক'রে তাদের শাস্তি দিতে হবে; তার জন্যে তুমি ভেবো না। কিন্তু আজ ষষ্ঠী। যে কোরেই হোক, আজ তোমার বাড়ীতে যখন মায়ের আগমন হয়েছে, তখন হিঁদু হয়ে আর কায়স্থের ছেলে হ'য়ে তুমি বাপু মাকে টেনে রাস্তায় ফেল্‌তে পার্‌ছ না। তাতে তোমারও অধর্ম্ম, গ্রামেরও অপযশ। আমরা দশজন থাক্‌তে এমন অধর্ম্মের কাজটা কেমন করে হ'তে দিই, তুমিই বল দেখি?

"তা'হলে আপনি কি ক'রতে বলেন ?"

"আমি বলি, যে করেই হোক, কোন রকমে মায়ের পূজাটা তোমাকে ক'রতেই হবে।"

"আপনি ত করতেই হবে বলে খালাস। পূজো করা কি ছেলেখেলা! বল্‌তে গেলে বৃষোৎসর্গের ব্যাপার। আমার সাধ্যি কি এ তাল আমি সামলাই ;—সে আমি কিছুতেই পারব না। আমি গরীব মানুষ, কোনরকমে কায়ক্লেশে বেঁচে আছি। আমি কি করে পূজো করব? আপনার ইচ্ছে হয়, আপনার বাড়ীতে প্রতিমাখানি নিয়ে যান, পূজো করুনগে।"

বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "শীতল, মায়ের কাছে সেই প্রার্থনাই কর, আমার যেন মায়ের পূজো করবার মত অবস্থা হয়। তখন তোমরা না বল্‌লেও আমি মাকে বাড়ীতে আনবো। কিন্তু তুমি ত জান, আমার কি অবস্থা। আমি বলি কি, মহেশকে ডেকে আনি। সে তোমার পুরোহিত। যাতে কোন রকম ব্যয়বাহুল্য না করে মায়ের পূজোটা হ'য়ে যায়, তারই মত ব্যবস্থা করে দিই। এই ধর—একশ টাকা হলেই তিন দিনের পূজো অমনি নমো-নমো করে সেরে দেওয়া যেতে পারে।"

"এক—শ' টাকা! আপনি বলেন কি গদা কাকা? আমার কি একশ' টাকা খরচ করবার অবস্থা? আমি সোজা কথা বলছি, আমি এক পয়সাও খরচ করতে পারব না।"

"তা হলে যা ভাল বোঝ কর বাপু। আমরা তোমার হিতৈষী, এ ক্ষেত্রে যা সৎপরামর্শ, তাই তোমাকে দিলাম।" এই বলিয়া লাহিড়ী মহাশয় ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।

মল্লিক এতক্ষণ উঠানে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছিলেন; এখন বারান্দায় উঠিয়া প্রতিমার সম্মুখে চাপিয়া বসিলেন।

তখন নেত্য বলিল, "বসে-বসে ভাবলে কি হবে দাদা, যা হয় একটা ঠিক করে ফেল। ষষ্ঠীর দিন—মা যখন বাড়ীর ওপর এসেছেন, তখন বিদায় কর কি বলে?"

"বিদায় করব না ত কি ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজো ক'রতে হবে? সে আমার দ্বারা হচ্ছে না; থাক্ যেমন আছে ঠাকুর, তেমনি থাক্। আমি পূজোও কচ্ছিনে, ফেলেও দিচ্ছিনে। একশ' টাকা গাছের ফল আর কি! কুড়িয়ে আনলেই হল? সব বেটারাই ভাবে, আমার না জানি কত টাকাই আছে। যাক গে, আর বকতে পারিনে" এই বলিয়া মল্লিক বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই পুরোহিত মহেশ ভট্টাচার্য্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাড়ীর মধ্যে যাইয়া দেখেন, মল্লিক মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,

"ও মল্লিক-দা, বসে ভাব্‌লে কি হবে? একটা ব্যবস্থা ত কর্‌তে হবে।"

"যাও হে যাও, তোমার আর মুরুব্বিগিরি করতে হবে না। পূজো করতে হয় আমিই ক'রবো। তোমার কিছু করতে হবে না। তুমি নিজের পথ দেখ।"

"তুমি পূজো কর্‌বে? পূজো করবার তোমার অধিকার কি?"

"অধিকার-টধিকার বুঝিনে ঠাকুর! যা করতে হয় আমি করব এখন; আমি বামুণও ডাক্‌ব না, পুরুতও ডাক্‌ব না।"

"তুমি পাগল হ'লে নাকি? এমন অনাছিষ্টি কথাও ত কখন শুনিনি। তুমি কায়েতের ছেলে, তুমি পূজো করবে কি? এখনো ত কলির শেষ হয় নি! পাগলের মত কথা বলো না; এখন যাতে যা হয়, এস তাই স্থির করি।"

"তোমার কিছু স্থির করতে হবে না মহেশ!"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেখিলেন, এখানে কথা বলা নিতান্তই নিরর্থক,—হয় ত বা অপমানই হইতে হইবে। এই ভাবিয়া তিনি নেত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "পূজো যদি না করাই স্থির হয়, তা'হলে প্রতিমাখানি রাস্তায় ফেলে দিয়ে আস্‌তে বোলো।"

"ফেলে দিই আর ঘরে তুলে রাখি, সে আমি বুঝব; সে পরামর্শ কারুর কাছে নিতে যাব না।"

(৩)

বেলা আটটা পর্য্যন্ত মল্লিক চুপ করিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিলেন। তাহার পর উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেলেন। নেতা তখন উঠানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। সে বেশ শুনিতে পাইল, তাহার দাদা লোহার সিন্দুক খুলিলেন এবং একটু পরেই বন্ধ করিলেন।

তাহার পর চাদরখানি কোমরে জড়াইয়া, পুরাতন জীর্ণ ছাতাটী হাতে করিয়া বাহিরের উঠানে আসিয়া নেত্যকে বলিলেন "আমি ফুলতলার হাটে চল্লাম। আমার আসতে দেরী হবে। তুই আর আমার জন্য বসে থাকিস্‌নে; তোর মত দুটো রেঁধে খাস্‌; আমি জল-টল খেয়েই আস্‌ব। আর দেখ্‌, বিপিন আর পাঁচুকে পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। যা যা করতে হবে, তাদের বলে যাচ্ছি। তারা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ দেখিস্‌ যেন লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়ারা ঠাকুরখানি ভেঙ্গে না ফেলে।"

"কি ঠিক করলে দাদা?"

"ঠিক আবার কি করবো—পূজোটুজো আমার দিয়ে হচ্ছে না।"

"তবে আর সাত-তাড়াতাড়ি ফুলতলায় যাওয়া কেন? খেয়ে-দেয়ে হাটে গেলেই হোতো!"

মল্লিক সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

একটু পরেই চারি-পাঁচজন মজুর আসিয়া নেত্যকে বলিল "দিদিঠাকরুণ, কর্ত্তা ব'লে গেলেন, বাইরের আর ভিতরের উঠোনের পাশে দক্ষিণ-মুখো করে একটা চালা বাঁধতে হবে। সেইখানেই না কি প্রতিমা রাখা হবে। ঘরে যে কখানা টিন আছে, তাই দিয়ে চালা বাঁধতে হবে।"

নেত্য তখন বুঝতে পারল, তাহার দাদা পূজোর জিনিস পত্র কিনবার জন্যই এত তাড়াতাড়ি ফুলতলায় গেলেন।

এ অঞ্চলের মধ্যে ফুলতলার বাজার ও হাট প্রসিদ্ধ— এত বড় বাজার, আর শনি মঙ্গলবারে এত বড় হাট সে অঞ্চলে আর কোথাও হয় না।

সে দিন মঙ্গলবার ষষ্ঠী—সেদিনের হাটে অনেক দ্রব্য আসিবে। অনেক দূর হইতে অনেক ক্রেতা এই মঙ্গল-বারের হাটে পূজার জিনিসপত্র কিনিবে। নেত্যর মনে বড়ই আনন্দ হইল,—তাহার দাদার নিশ্চয়ই সুমতি হইয়াছে!

সে তখন মহা উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল;—কোথায় কি করিতে হইবে, তাহা মজুরদিগকে বলিয়া দিতে লাগিল, —মজুরেরা কিন্তু কর্ত্তা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে ঠাণ্ডা মল্লিক ফুলতলার হাটে যাইয়া দেখিলেন, তখন জিনিসপত্র আমদানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি

প্রথমেই ময়রাদের দোকানে গেলেন। বাজারে সাত-আট-খানি ময়রার দোকান। যে দোকানে যত চিড়ে-মুড়কি ছিল, তাহা সমস্তই তিনি কিনিয়া ফেলিলেন এবং দোকানদার-দিগকে বলিলেন যে, পূজার তিনদিন যে যত নারিকেলের সন্দেশ দিতে পারিবে, তিনি তাহাই লইবেন।

দোকানদারেরা সকলেই মল্লিকের এই কার্য্যে অবাক্ হইয়া গেল। মল্লিক তাহাদিগকে বলিলেন "কি করি, শালারা আজ ষষ্ঠীর দিন প্রতিমা বাড়ীর উপর ফেলে গেছে। মাকে পূজো করি আর না করি, না খাইয়ে ত রাখ্তে পারিনে; তাই চাট্‌টে চিড়ে-মুড়কি নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা সবাই প্রসাদ পেতে যেও।"

কথাটা হাটময় রাষ্ট্র হইয়া গেল; সকলেই এই কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মল্লিক তখন হাটে যত চিড়ে মুড়কি বাতাসা আমদানি হইল, সমস্ত কিনিয়া ফেলিলেন। পঁচিশ ত্রিশখানি গ্রামের পূজা-বাড়ীর লোকেরা এই হাটে চিড়ে মুড়কি প্রভৃতি কিনিবে বলিয়া আসিয়াছিল; তাহারা কেহই এক সের দ্রব্যও পাইল না। মল্লিক হাটে সমাগত গোয়ালাদিগকে দধির কথা বলিলেন; কিন্তু কেহই এত অল্প সময়ের মধ্যে দধি সরবরাহ করিতে সাহসী হইল না। মল্লিক বলিলেন "যাক্, বেটীকে এবার শুক্‌নো চিড়েই চিবুতে হবে—আমি কি করবো!"

চিড়া, মুড়কি, বাতাসা, পাতা, হাঁড়ি, কলসী, প্রভৃতি কিনিয়া ঠাণ্ডা মল্লিক স্তূপাকার করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর কয়েকখানি গরুর গাড়ীতে সেই সকল দ্রব্য বোঝাই হইতে লাগিল। বোঝাই শেষ হইলে গাড়ীগুলি বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া, তিনি ময়রাদিগকে নারিকেলের সন্দেশের জন্য যাহার যাহা প্রয়োজন, সেই পরিমাণ টাকা বায়না করিলেন।

তাহার পর হাটের মধ্যে নিমে ঢুলীর সহিত তাঁহার দেখা হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন "দেখ্ নিমচাঁদ, তোকে একটা কাজ করতে হবে। আজ এই হাটে এখনই ঢোল-সহরত দে, যে, কাল থেকে তিনদিন আমার বাড়ীতে মায়ের পূজা হবে; সব দুঃখী-কাঙ্গালীর নিমন্ত্রণ। শুধু হাটেই সহরত দিলে হবে না; গাঁয়ে-গাঁয়ে বলে দিতে হবে। আজ এই টাকাটা নে, তার পর তোর যা পাওনা হবে, পূজোর পর মিটিয়ে দেব। সব দুঃখী-কাঙ্গালী—বুঝলি ত!"

বেলা প্রায় আড়াইটার সময় মল্লিক হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; দেখিলেন মজুরেরা চণ্ডীমণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছে এবং বাহিরের প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছে।

একটু পরেই জিনিসপত্র বোঝাই পাঁচখানা গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। মল্লিক মজুরদিগকে বলিলেন, "ওরে,

ও সব এখন থাক; আগে জিনিসগুলো নামিয়ে ঘরে তোল্।”

নেতা তখন তাড়াতাড়ি আসিয়া জিনিসগুলি ঘরে তুলিতে-তুলিতে বলিল, “পূজোর জিনিস কৈ দাদা!”

দাদা রুক্ষস্বরে বলিলেন, “এই ত সব পূজোর জিনিস। আবার কি লাগ্‌বে?”

নেতা বলিল “এ সব ত চিঁড়ে-মুড়কি? পূজোর জন্য যে সব জিনিস লাগবে, তা ত দেখ্‌ছি নে। সে সব বুঝি আস্‌ছে।”

“না, না, আর কিছু আস্‌বে না। দই ত পাওয়া গেল না; কেউ দিতে স্বীকার হোলোই না। আর নারিকেলের সন্দেশ,—তা কাল থেকে আস্‌তে আরম্ভ হবে। আমি সব ঠিক করে এসেছি। বেটীর যেমন অদেষ্ট, শুকনো চিঁড়ে খাক্—আমি কি করব।”

“তা ত বুঝলাম দাদা, কিন্তু মায়ের পূজো ত করতে হবে? তার জিনিস কৈ?”

“যা—যা, আর বকাবকি করতে পারিনে। পূজো,—পূজো আবার কি? ও-সব ঘণ্টা-নাড়া আর ফুল-বেলপাতা দেওয়া—সে হচ্চে না।”

নেতা অবাক্ হইয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; এমন অনাসৃষ্টি ত সে কখনও দেখেও নাই, শোনেও নাই।

“বেলা যে তিন পহর হয়ে গেল, একটু তেল্' দে, স্নানটা

সেরে নিই। আজ আর খাওয়া-দাওয়ার সময় নেই—এখনও আমার অনেক কায বাকী।”

(৪)

তাড়াতাড়ি স্নান শেষ করিয়া ঠাণ্ডা মল্লিক গ্রামের মধ্যে বাহির হইলেন। সকলে শুনিল যে, মল্লিক দুঃখী-কাঙ্গালী ভোজনের বিপুল আয়োজন করিতেছে।

মল্লিক প্রথমেই লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন, এবং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “কাকামশাই, এক রকম ত কোরে ফেল্‌লাম। তোমার ও পূজো-টুজো আমি করব না; সে তোমাকে যা বলেছি, তাই হবে। বেটা যখন বাড়ীতে এসেছে, তখন না খাইয়ে ত আর রাখতে পারিনে, তাই দুটো চিড়ে-মুড়কির আয়োজন করেছি। সব কাঙ্গাল দুঃখীকে নিমন্ত্রণ করতে পাঠিয়েছি। মায়ের নাম করে তারা তিনদিন খাবে—সেই আমার পূজো। তোমরা সবাই গিয়ে দেখ্‌বে। যাতে মায়ের একটী কাঙ্গাল ছেলেও না খেয়ে চলে যেতে না পারে, তাই তোমাকে দেখ্‌তে হবে কাকা!”

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, “সে বেশ করেছ শীতল, কিন্তু শাস্ত্রানুসারে পূজা-অর্চ্চনাও ত করা চাই; নইলে যে মহা অপরাধ হবে।”

“মায়ের কাঙ্গাল ছেলে-মেয়েরা পেট ভরে খাবে, এতে

যদি মায়ের পূজো না হয়, এতে যদি মা খুশী না হন,—তা হলে অমন মায়ের পূজো আমি করি নে !”

লাহিড়ী মহাশয় আর কথা বলিলেন না।

মল্লিক গ্রামের প্রত্যেকের বাড়ী যাইয়া সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যথারীতি পূজা হইবে না শুনিয়া যদিও সকলেই আপত্তি করিলেন, কিন্তু মল্লিককে দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া সকলেই কাঙ্গালী-ভোজনের সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় গ্রামের মুরুব্বিরা মল্লিকের বাড়ী আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা পূজার ব্যবস্থা করিবার জন্য মল্লিককে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই এক কথা—“আমি যা ব্যবস্থা করেছি, তাতে যদি মায়ের পূজো না হয়, না হবে।”

ইতঃপূর্ব্বেই কয়েকজন লোকের সাহায্যে প্রতিমাকে নবনির্ম্মিত মণ্ডপে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। পূজার আসন দেওয়া হয় নাই, ডাকের সাজ দিয়া প্রতিমাকে সাজান হয় নাই, এমন কি নবনির্ম্মিত মণ্ডপে গোবর ছড়া পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই। মণ্ডপের মধ্যে প্রতিমার সম্মুখে একটী মৃৎপ্রদীপ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল। তাহাতে অন্ধকার দূর না হইয়া আরও বেশী অন্ধকার বোধ হইতেছিল।

সকলেই মল্লিকের এই অদ্ভুত ব্যবস্থার কথা লইয়া আলোচনা-আন্দোলন করিতেছিল। এমন সময় একজন

অপরিচিত ভিখারী আসিয়া মায়ের মণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একতারা বাজাইয়া গান ধরিল—

"শক্তিপূজা কথার কথা না!
যদি কথার কথা হোতে, চিরদিন ভারত
শক্তি পূজে শক্তিহীন হোত না।
কেবল ডাকের গর্জনায়, ঢাকের বাজনায়
শক্তিপূজা হয় না।
এক মনোবিল্বদলে, ভক্তি-গঙ্গাজলে,
শতদল দিলে হয় সাধনা। (হৃদয়)
দিলে আতপান্ন, কি মিষ্টান্ন, মা যে তাতে ভোলেন না;
কেবল জ্ঞান-দীপ জেলে, একান্ত ধূপ দিলে
ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা।
বনের মহিষ অজা, মায়ের বাছা, মা সে বলি লন না;
যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থ কর নাশ,
বলিদান কর বিলাস-বাসনা।
কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাত-বিচারে শক্তিপূজা হয় না।
সকল 'বর্ণ' এক হ'য়ে, ডাক মা বলিয়ে,
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া ভিখারীর এই গান শুনিল।

গান শেষ হইলে মল্লিক বলিলেন "শুনলে তোমরা, মা নিজে গান শুনিয়ে গেলেন। আরে, শীতল মল্লিক কি আর শাস্ত্র জানে না।"

তাহার পরই প্রতিমার সম্মুখে যাইয়া গললগ্নীকৃতবাসে করযোড়ে বলিলেন "মা, তোর কাঙ্গাল ছেলেরা তোর পূজো করবে, সেই পূজোই তোকে নিতে হবে। বল্ মা, পুরুতের পূজো নিবি—না কাঙ্গাল ছেলেদেরই পূজো নিবি?" এই বলিয়া মল্লিক মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন।

কি দেখিলেন, তাহা তিনিই বলিতে পারেন। একটু পরেই বলিয়া উঠিলেন "ওরে, আমি কি আর তা বুঝি নেই। ঐ দেখ্, মা হাস্‌ছেন। ঐ দেখ্, মা বল্‌চেন—শীতল, আমি তোর পূজোই নেব।" শীতল মায়ের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণাম করিলেন।

(৫)

গ্রামের লোকেরা মনে করিয়াছিল, মল্লিক যাহাই বলুক না কেন, পূজা তাহাকে করিতেই হইবে। কিন্তু অপরাহ্নে মল্লিক যখন ফুলতলার হাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন দ্রব্যাদি দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল ঠাণ্ডা মল্লিকের যে কথা সেই কায।

তখন মহেশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে থিয়েটারের যুবকদল মিলিত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শ-মত অতি গোপনে সেই বাড়ীতেই পূজার দ্রব্যাদি আহরণ করিতে লাগিল। থিয়েটারের ফণ্ড হইতে টাকা লইয়া যুবকদল হাটে, বাজারে, নানাদিকে ছুটিল; রাত্রি আটটা-নটার মধ্যেই 'পূজার

দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সংগৃহীত হইল। ঠাণ্ডা মল্লিক এ ব্যাপার বর্ণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না।

সপ্তমীর দিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই মল্লিক তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন, "আমাকে এখনি একবার ফুলতলার বাজারে যেতে হচ্ছে। ময়রাদের বিশ্বাস নেই, তারা যদি সময়মত সন্দেশ না নিয়ে আসে, তা'হলে বড়ই মুস্কিল হবে। আমি একবার গিয়ে দেখে আসি; এই ঘণ্টা-দুইয়ের মধ্যেই ফিরে আস্‌বো।"

এই বলিয়া মল্লিক ফুলতলায় চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া যুবকদল সপ্তমী-পূজার দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল।

সাতটা বাজিতে না বাজিতেই পুরোহিত মহেশ ভট্টাচার্য্য সমস্ত দ্রব্য গোছাইয়া লইয়া পূজায় বসিলেন; ব্রাহ্মণ যুবকগণ আয়োজন করিয়া দিতে লাগিল।

একটু পরেই ঠাণ্ডা মল্লিক বাড়ীতে আসিয়া দেখেন, তাঁহার পুরোহিত মহেশ ভট্টাচার্য্য যথারীতি পূজা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন; পূজার দ্রব্য-সম্ভারে চণ্ডীমণ্ডপ পূর্ণ রহিয়াছে। সামান্য একটুও ত্রুটী নাই।

এই দৃশ্য দেখিয়া মল্লিক স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি যে কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

সহসা তাঁহার দৃষ্টি দুর্গা-ঠাকুরাণীর দিকে আকৃষ্ট হইল;

তিনি স্পষ্ট দেখিলেন, মা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্য করিতেছেন। এমন মনোহর মূর্ত্তি, এমন সহাস্য বদন তিনি ত জীবনে কখন দেখেন নাই! তাঁহার তখন মনে হইল, পূজার যে আয়োজন তিনি করিয়াছেন, তাহা হয় ত মায়ের মনের মত হয় নাই; তাঁহার মনে হইল পূর্ব্বদিন তিনি মায়ের যে হাসিমুখ দেখিয়াছিলেন, সে হাসিমুখ নহে—ভ্রূকুটি—তাঁহারই দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছিল।

আবার তিনি মায়ের মুখের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন সত্যসত্যই মায়ের বদন প্রফুল্ল।

গভীর মর্ম্মবেদনায় তিনি চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি মা, আমার পূজা তুই নিবি না? আমি যে তোর নাম করে, তোর গরীব-দুঃখী ছেলেদের পূজো ক'রতে চেয়েছিলাম, তাতে কি তোর পূজো হ'ত না মা? তবে কি তোর গরীব-দুঃখী ছেলেমেয়েদের আজ ফিরিয়ে দেব? তাদের কি ব'লব, তোরা সব চলে যা; তোদের পূজো করলে মায়ের পূজো হবে না?"

তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল; তিনি আর একটা কথাও বলিতে পারিলেন না; তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সমস্ত জগৎ অন্ধকার হইয়া গেল;—ক্ষণকালের জন্য তাঁহার চেতনা লুপ্ত হইল।

পরক্ষণেই তাঁহার লুপ্ত-সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহেশ, ভাল ক'রে পূজো কর ভাই! মা

বল্‌ছেন, তোমার পূজোও নেবেন, আমার পূজোও নেবেন। এই যে মা ব'লে গেলেন 'ওরে, সবাই আমার ছেলে। যে যেভাবে আমার পূজো করে, প্রাণ দিয়ে করলে আমি তাই গ্রহণ করি। মা দুর্গে, আমার কি শক্তি যে তোর পূজো করি মা! আমি ত তোকে একদিনও ডাকিনি; আমি ত তোকে একদিনও চাইনি। আমি চেয়েছি টাকা,—তা তুই আমাকে ঢের দিয়েছিস্‌। এখন তোর জিনিস তুই বুঝে নে,—তোর টাকা তোর পূজোয় তুই লাগা, আমায় ছুটি দে'।" এই বলিয়া শীতল মল্লিক বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন, ভক্তের অশ্রুবিন্দুতে মহামায়ার মহাপূজা সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

তাহার পর তিনদিন ধরিয়া মল্লিকের অঙ্গনে শত-শত দীন-দরিদ্র, অনাথ-অনাথা মায়ের প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইয়া গেল। শীতল মল্লিক চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়ান, আর এক-একবার চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া করযোড়ে বলেন,—

"জয় মা আনন্দময়ী!"

মায়ের অভিমান

বাবা ছিলেন গ্রামের ইংরাজী স্কুলের মাষ্টার। বেতন পাইতেন ত্রিশটী টাকা। পরিবারের মধ্যে মা, বাবা, আর আমরা দুটী ভাই। দাদা আমার দুই বছরের বড়। এই চারিজন মানুষের ত্রিশ টাকায় বেশ চলিয়া যাইত; সঞ্চয় কিছুই হইত না। বাবা বলিতেন "কার জন্য সঞ্চয় করব; আর টাকা রেখে গেলেই যে আমার স্ত্রী-পুত্র সুখে থাক্‌বে, তারই বা নিশ্চয়তা কি। মতি হালদার যে মরবার সময় জমিদারীতে, বাড়ীতে, আর নগদে অতি কম হলেও যাট হাজার টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর চার বছরের মধ্যেই দুই ছেলেতে সব উড়িয়ে দিল। এখন তাদের কত কষ্ট। আর হেমন্ত রায় যে, ছেলে-বৌকে একেবারে বল্‌তে গেলে পথে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল,—সেই হেমন্ত রায়ের ছেলে সত্যেন্দ্র যে এখন কলেজের অধ্যাপক। সব অদৃষ্ট! রেখে গেলেও হয় না, আর না রেখে গেলেও বাধে না।" অর্থাৎ বাবা ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন। আর তাও বলি, ত্রিশ টাকা আয় হইতে, চেষ্টা করিলে, মাসে আর কতই বা সঞ্চয় করিতে পারিতেন,—জমাজমি কিছুই ছিল না; নির্ভর ঐ মাষ্টারীর উপর।

পরের ছেলে পড়াইতেন বলিয়া নিজের ছেলেদের পড়ায় অযত্ন করিতেন না। আমরা দুই ভাই বাড়ীতে বাবার কাছে যথারীতি পড়িতাম। সেই জন্যই আমাদের গ্রামের সামান্য স্কুল হইতেই দাদা পনর টাকা বৃত্তি পাইয়া কলিকাতায় এফ-এ পড়িবার সুবিধা করিতে পারিয়াছিল। বৃত্তির পনর টাকা, আর বাবা মাসে-মাসে দিতেন পাঁচ টাকা — এই কুড়ি টাকাতেই সে সময় একটী ছেলের এফ-এ পড়া কলিকাতা সহরে থেকে বেশ চলে যেত।

দাদা এফ-এ পরীক্ষা দিল, আমি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিলাম—একই বৎসরে। পরীক্ষার পর দাদা বাড়ীতে আসিল। বাবা তখন মহা চিন্তায় পড়িলেন। এফ-এতে দাদা যদি বৃত্তি না পায়, আর আমিও যদি এণ্ট্রান্সে বৃত্তি না পাই, তাহা হইলে আমাদের দুই ভাইয়ের পড়ার খরচ তিনি কেমন করিয়া চালাইবেন, এই হইল তাঁহার চিন্তার বিষয়। তিনি কোন উপায়ই ভাবিয়া পাইলেন না। কিন্তু মানুষের সকল ভাবনা যিনি অলক্ষ্যে বসিয়া দিনরাত ভাবিতেছেন, তিনি ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাবা যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল ;—দাদা প্রথম বিভাগে এফ-এ পাশ করিল ; কিন্তু বৃত্তি পাইল না ; আর আমি তৃতীয় বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করিলাম—আমার বৃত্তি পাওয়ার ত কথাই নাই। তবে আমাদের পড়াইবার ভাবনা আর বাবাকে ভাবিতে হইল না—সকল ভাবনার মালিক

তিন দিনের জন্য জ্বর পাঠাইয়া দিয়া বাবাকে ভাবনা-সমুদ্রের পারে লইয়া গেলেন; ভাবনার ভার পড়িল মায়ের উপর। বাবার ছিল এক ভাবনা—আমাদের পড়ার খরচ যোগানো; মায়ের উপর দিয়া গেলেন দুই ভাবনা—সংসার প্রতিপালন আর আমাদের দুই ভাইয়ের শিক্ষাবিধান।

এখন উপায়? দাদা বলিল, "আমি পড়াশুনা ছেড়ে চাকরীতে প্রবেশ করি, বসন্ত কলেজে যাক্। আমি যা উপার্জ্জন করব, তাতে ওর পড়ার খরচ, আর মায়ের আর আমার খরচ চলে যাবেই।"

আমি বলিলাম "মা, দাদার প্রস্তাব ঠিক হোলো না। কেন, তাই বল্‌ছি। দাদা ফাষ্ট´ ডিবিসনে এফ-এ পাশ করেছে, বৃত্তিই পায় নাই। দাদা পড়লে দুই বছরে নিশ্চয়ই বি-এ পাশ করতে পারবে। তার পর বুঝলে মা; দেখ্‌তে-দেখ্‌তে এম-এ, বি-এল। তখন সবই করতে পারবে; ডিপুটী, মুন্সেফ হতে পারবে, প্রফেসার হতে পারবে, উকিল হতে পারবে, চাই কি হাইকোর্টের জজ পর্য্যন্ত হতে পরে। আর আমার কি হবে? যে থার্ড ডিবিসনে এণ্ট্রান্স পাশ করে, সে কোন দিন এফ-এ পাশ করতে পারে না—ক-খনো না। এ আমি ঢের দেখেছি। তাই আমি বলি কি, আমি মাষ্টারী করি। বাবার পোষ্ট আমাকে দেবে না, দুই একজনকে প্রমোসন দিয়ে আমাকে নীচের ক্লাসের মাষ্টারী দেবেই। মোহিত বাবুকে বল্‌লেই,

তিনি অন্ততঃ বাবার কথা মনে করে, এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবেন। কুড়ি টাকা নিশ্চয়ই পাব। তার পর এ-বেলা একটা, ও-বেলা একটা ছেলে পড়াব। তাতেও দশটা টাকা পাব। মাইনের টাকা দাদার পড়ার খরচের জন্য দেব; আর ছেলে পড়িয়ে যে দশ টাকা পাব, তাতে আমাদের দুজনের চলে যাবে, কি বল মা?"

দাদা বলিল, "শুন্‌লে মা, ষ্টুপিডের কথা। উনি চাকরী করবেন, আর আমি পড়ব। সে কিছুতেই হয় না— হতেই পারে না; এ পৃথিবীতে কখন হয় নাই। ও সব পাগলামী ছেড়ে দে! তুই ত হঠাৎ থার্ড ডিবিসনে পাশ হয়েছিস্। আমরা সবাই জান্‌তাম, তুই ফার্ষ্ট ডিবিসনে পাশ হয়ে, আমারই মত স্কলারসীপ্ পাবি। ও-সব কি জানি —একজামিন পাশ একেবারে chanceএর উপর নির্ভর করে। কত গাধা তরে যায়, আবার কত ভাল ছেলে ফেল হয়ে যায়; এ আমি ঢের দেখেছি। তোকে পড়তেই হবে। আমি মাষ্টারী খুঁজে নেব, তার পর কমিটী পরীক্ষা দেব। যদি পাশ হতে পারি, তা হলে ওকালতী করব। আমার পথ হয়ে যাবে। কিন্তু তোর ভবিষ্যৎ কি? ঐ মাষ্টারী, আর ঐ কুড়ি টাকা। নাঃ, ও সব কাজের কথাই নয়। কি বল মা?" মা বলিলেন, "এ সম্বন্ধে কোন মত দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। শিশির, তুমি যা বল্‌ছ, তা অসঙ্গত নয়— তোমার মত সুবোধ ছেলেরই উপযুক্ত কথা। আর বসন্ত,

তুমি যা বল্‌ছ, তোমার মুখ দিয়ে সে কথা শুনে, আমার এত দুঃখে, এত কষ্টেও আহ্লাদ হচ্ছে। স্বর্গে ব'সে তিনিও তোমাদের কথা শুনে কত সুখী হচ্চেন। কিন্তু, আমি এতে কি বল্‌তে পারি? কাকে বল্‌ব যে 'তুমি লেখাপড়া ছেড়ে দেও'। সে কথা ত আমার মুখ দিয়ে বের হবে না।"

আমি বলিলাম "মা, তুমি ত লেখাপড়া জান, আর আমাদের চাইতে তোমার জ্ঞানও বেশী। তুমিই এর একটা মীমাংসা করে দাও। তুমি যা বল্‌বে, আমরা তাই মাথা পেতে স্বীকার করব।"

দাদা বলিল, "মা ত বল্‌লেনই, আমার প্রস্তাব খুব সঙ্গত; তাতেই ত মায়ের মত পাওয়া গেল।"

আমি বলিলাম "তুমি বুঝতে পারছ না দাদা! তোমার প্রস্‌পেক্ট আছে, আমার কিছুই নাই। আমার বিদ্যাবুদ্ধি কতখানি, তা আমি বেশ বুঝি; আর তুমি কি করতে পার না পার, তা তোমার চাইতে আমি বেশী বুঝি। আমি যা বল্‌লাম, তাই করতে হবে। আমি কিছুতেই আর পড়ব না—তোমাকে পড়তেই হবে। তোমার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল, তা আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুমি আপত্তি কোরো না; বেশ করে ভেবে দেখ—আমার কথা ঠিক কি না।"

দুই-তিন দিন এই কথা লইয়া তর্কবিতর্ক হইল; গ্রামে

যাঁরা আমাদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন, তাঁরা সকলেই আমার প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন;—স্কুলের সেক্রেটারী মোহিতবাবু এবং হেডমাষ্টার মহাশয় আমার প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন, আমিই জয়ী হইলাম। স্কুলের মাষ্টারী আমার হইল; বেতন কুড়ি টাকাই আপাততঃ স্থির হইল। দুইটী ছেলে পড়াইবারও ভার পাইলাম। দাদা কলিকাতায় বি-এ পড়িতে গেল, আমি গ্রামের স্কুলে মাষ্টারী করিতে লাগিলাম।

(২)

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন জিনিসপত্র সুলভ ছিল, তাই কোন রকমে দশ টাকায় আমাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কষ্ট হইত—কিন্তু তাহা বলিয়া উপায় নাই; কোন রকমে তিনটা বৎসর কাটাইতে পারিলেই দাদা এম-এ পাশ করিবে। তখন আর কোন কষ্ট থাকিবে না।

দাদা সেই যে কলিকাতায় পড়িতে গেল, দুই বৎসরের মধ্যে আর বাড়ী আসিল না। মধ্যে-মধ্যে পত্র লিখিত। বাড়ী আসিবার কথায় লিখিত যে, একবার যাতায়াতে অনেক খরচ, তাহা কোথা হইতে সংগ্রহ হইবে? কথাটা ঠিক; সে খরচ সত্যসত্যই আমি সংগ্রহ করিয়া দিতে অসমর্থ। সুতরাং দাদাকে অগত্যা এই নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে হইল।

দাদা যেবার বি-এ পরীক্ষা দিবে, সেবার ফিয়ের টাকা লাগিল। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া বাড়ীর একখানি ঘর বেচিয়া ফেলিলাম; মা চক্ষের জল ফেলিলেন; কিন্তু উপায়ান্তর নাই দেখিয়া আপত্তি করিলেন না। ঘর বিক্রয়ের ৮৫ টাকাই দাদাকে পাঠাইয়া দিলাম—ফি দিতে হইবে; ধারকর্জ্জ সামান্য যাহা হইয়াছে, তাহা শোধ দিতে হইবে; তাহার পর বাড়ী আসিবার খরচ। দাদা লিখিল, ঐ টাকাতেই তাহার কুলাইয়া যাইবে। কেমন করিয়া এ টাকা সংগ্রহ হইল, তাহা জানিতে চাহিলেও, আমি সে কথার উত্তর লিখিলাম না,—দাদার মনে যে কষ্ট হইবে!

পরীক্ষার পর দাদার পত্র পাইলাম; লিখিয়াছে যে, পরীক্ষা খুব ভাল হইয়াছে। তখন বি-এ অনারের সৃষ্টি হয় নাই; বি-এস্সি, এম্-এসসি হয় নাই। সেই পত্রেই দাদা লিখিল যে, তাহার বাড়ী আসিতে কয়েকদিন বিলম্ব হইবে। তাহার এক সতীর্থ কিছুদিনের জন্য মধুপুরে সপরিবারে বেড়াইতে যাইতেছেন; তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে দাদা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে বাধ্য হইল। সেখানে সে বেশী দিন থাকিবে না; দশ-পনের দিন পরেই বাড়ী আসিবে।

দুই বৎসর দেখা নাই; পরীক্ষার পরই বাড়ী আসিবার কথা; তাহা না করিয়া দাদা বন্ধুর সঙ্গে মধুপুরে গেল।

ইহাতে মা একটু বিষণ্ণ হইলেন; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলিলেন না। আমারও মনে কষ্ট হইল; কিন্তু তখন কি জানিতাম যে, ইহা অপেক্ষাও অধিকতর মনোবেদনা ভগবান্ আমাদের জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছেন!

দাদা পনের দিনের কথা লিখিয়া মধুপুর গেল; সেখান হইতে একখানি পত্রও লিখিল না। মধুপুরের ঠিকানাটাও যদি লিখিত, তাহা হইলে আমরাই না হয় পত্র লিখিয়া তাহাকে আমাদের কথা মনে করাইয়া দিতাম; এবং পত্রের উত্তরে তাহার সংবাদও পাইতাম। প্রায় ২৫ দিন পরে দাদার এক পোষ্টকার্ড পাইলাম; তাহাতে সে লিখিয়াছে যে, তাহার বন্ধুরা তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া দিতেছেন না, তাই সে এত বিলম্ব করিতেছে। যাক্, বাড়ীতে আসুক আর না আসুক, দাদা যে ভাল আছে, ইহাতেই আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। 'আমরা' বলাটা বোধ হয় ঠিক্ হইল না; কারণ, আমি নিশ্চিন্ত হইলেও, মায়ের মনে যে বড়ই চিন্তা হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ভাব দেখিয়া, এবং দুই-একটা কথা শুনিয়াই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মা একদিন বলিলেন, "আজ দুই বৎসর শিশিরকে দেখি নাই। শরীর কেমন আছে, কি করিয়া বলিব।" আর একদিন বলিলেন, "দেখ বসন্ত, শিশিরের মা-অন্ত প্রাণ ছিল।" আমি আর এ সকল কথার কি উত্তর দিব।

মনে-মনেই বুঝিতে পারিলাম, মা দাদার এই আচরণে কত ব্যথা পাইয়াছেন।

এক মাস পরে হঠাৎ একদিন দাদা বাড়ী আসিল। কিন্তু যে দাদা আমার দুই বৎসর আগে বি-এ পড়িবার জন্য কলিকাতায় গিয়াছিল, সে দাদা ত আসিল না,—সে সদানন্দ পুরুষ ত আসিল না, সে বসন্ত-বলিতে-অজ্ঞান ভাই ত আসিল না। দাদা বড়ই গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল। বি-এ পাশ করিলে যে এত গম্ভীর হইতে হয়, তাহা ত দেখি নাই। কলিকাতায় কখন যাই নাই, সেখানকার বাতাস কেমন, তাহাও জানি না; কিন্তু গ্রামের আরও অনেক ছেলে ত কলিকাতায় পড়িয়াছে, বি-এ পাশও অনেকে করিয়াছে। কিন্তু কৈ, কেহই ত দাদার মত এত গম্ভীর হয় নাই।

দাদা বাড়ী আসিবার পরদিন আমরা দুই ভাই আহার করিতে বসিয়াছি, মা সম্মুখে বসিয়া আছেন, সেই সময় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা দাদা, তুমি এই দু'বছরে এত গম্ভীর হয়ে গেলে কি করে?"

দাদা একটু হাসিয়া বলিল, "কৈ রে, তুই আমাকে গম্ভীর কি দেখ্‌লি?"

আমি বলিলাম, "দাদা, তুমি আমার কাছে কি লুকোতে পার; আমি তোমার দু'বছরের ছোট বই ত নয়; তুমিও যা, আমিও তাই। তোমার যেন 'কি' একটা

হয়েছে, তাই তুমি এমন হয়ে গিয়েছ। এর আগেও ত কলকাতায় পড়তে গিয়েছিলে, তখন ত তুমি এমন ছিলে না! এইবার তোমার ভারি পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি, তা তুমি স্বীকার কর আর নাই কর।"

মা বলিলেন, "অনেক দিন পরে এসেছে, তাই বসন্ত, তোমার অমন বোধ হচ্ছে। বিদেশে ত মা-ও ছিল না, ভাই-ও ছিল না; তাই তাদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বল্‌তে হয়, যে আনন্দ করতে হয়, তা এই দু'বছরে ভুলে গিয়েছে। এখন আবার আমাদের কাছে এসেছে, এখন যে শিশির সেই শিশিরই দু'দিনে হয়ে পড়বে।"

তা হওয়ার আর সময় হইল না। সেই দিনই বিকালে একটা তার আসিল যে, দাদা প্রথম বিভাগে খুব উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পাশ হইয়াছে। যিনি তার করিয়াছেন, তাঁহার নাম হরেন্দ্র। তিনি দাদাকে অবিলম্বে কলিকাতায় যাইতে লিখিয়াছেন। দাদা বলিল, "মা, আমাকে ত কালই কল্‌কাতায় যেতে হয়।"

মা বলিলেন, "এই কতদিন পরে এলে, দু'চার দিন থাক্‌লে বড় ভাল হোতো। তা' যখন শীঘ্র যাবার জন্য তার এসেছে, তখন ত আর নিষেধ করতে পারিনে। লেখা-পড়া আগে, তার পর অন্য সব।"

আমি বলিলাম, "দাদা, আর দিন-দুই-তিন থেকে যেতে পার না?"

দাদা বলিল, "হয় ত তা হ'লে কোন ক্ষতি হতে পারে ; টেলিগ্রাম ত দেখ্‌লে, অবিলম্বে যেতে লিখেছে।"

আমি বলিলাম, "আচ্ছা দাদা, হরেন্দ্র কে ?"

দাদা বলিল, "হরেন্দ্র আমার একটী বন্ধু ; বি-এ পড়ছে। আমি ত ওদেরই সঙ্গে মধুপুর গিয়েছিলাম।"

আমি বলিলাম, "মাইনে পেতে এখনও দু'দিন দেরী হবে। তোমাকে ত টাকা দিতে হবে ; তাই থেকে যেতে বল্‌ছিলাম।"

দাদা বলিল, "আপাততঃ টাকার দরকার হবে না ; আমার কাছে যা আছে, তাতেই হবে। আর যদি খুব উপরে হয়ে পাশ করে থাকি, তা' হলে কলেজের স্কলারসিপ ত্রিশ টাকা হয় ত পেতেও পারি। তখন আর তোমাকে খরচ পাঠাতে হবে না ; তা' যদি নাই হয়,—আমি মনে করেছি, একটা টুইসন নেব, তা' হলে তোমাকে আর এমন করে টাকা পাঠাতে হবে না। আমার জন্য তোমাকে বড়ই কষ্ট করতে হয়েছে এই দুই বৎসর।"

মা বলিলেন, "না শিশির, তুমি ছেলে পড়িও না ; তাতে তোমার পড়ার ক্ষতি হবে। এত দিনই যখন চলেছে, আর কটা দিনই বা ;—বসন্ত যেমন করে হোক চালিয়ে নেবে। তার পর তুমি যখন পড়া শেষ করবে, তখন ত আর কষ্ট করতে হবে না। তখন বসন্ত না হয় চাকরী ছেড়ে দিয়ে কলেজে পড়তে যাবে।"

কি জানি কেন, আমার মনে হইল, মা আকাশে ফুলের বাগান প্রস্তুত করিতেছেন। মানুষ ভবিষ্যতের যে কিছুই দেখিতে পায় না, এ কথা আমি মানি না। আমি কিন্তু একটু-একটু ভবিষ্যৎ দেখিতে পাই। যাক্, সে কথা।

(৩)

দাদা কলিকাতায় পৌছিয়া একখানি কার্ডে পৌছা সংবাদ দিল; এবং সে যে কলেজের বৃত্তি নিশ্চয়ই পাইবে, এ কথাও জানাইল। যাক্, এখন আর দাদার পড়ার খরচ না দিলেও চলিবে; মাসে ত্রিশ টাকাতে তার বেশ চলে যাবে। আমি মনে করিলাম, ঘরে-দুয়ারগুলো একেবারে বাসের অযোগ্য হইয়াছে বলিলেই হয়; তাহার পর পশ্চিমের দিকের ঘরখানি বেচিয়া ফেলায় বাড়ীটা যেন কেমন হইয়াছে; এখন কিছু জমাইয়া ঐ ভিটায় একখান ঘর তুলিব, আর অন্য তিনখানি ঘরের সংস্কার করিব। আর বাড়ীতে বাহিরের কাজ করিবার জন্য একজন ঝি নিযুক্ত করিব—মা একেলা আর কত খাটিবেন। দাদার বিবাহ দিবার কথাও দুই-চারিজন তুলিয়াছিলেন; কিন্তু মা তাহাতে অসম্মত; তিনি বলেন, "এখন যে অবস্থা, তাতে শিশিরের বিবাহ দিতে পারি না; সে উপার্জ্জনক্ষম হইলে, তখন বিবাহ দিব। এতদিন গিয়েছে, আর দুইটা বৎসরও যাক।"

দাদা বাড়ী হইতে কলিকাতায় যাওয়ার দিন-পনর পরে

একদিন অপরাহ্নকালে স্কুল হইতে বাড়ী আসিয়া দেখি, মা বারান্দায় শয়ন করিয়া আছেন। এ সময়ে মাকে ত কোন দিন শুইয়া থাকিতে দেখি নাই। তবে কি তাঁহার কোন অসুখ করিয়াছে? আমি জামা-চাদর না খুলিয়াই মায়ের কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও মা, মা, তুমি অসময়ে অমন করে শুয়ে আছ যে? অসুখ করেছে না কি?"

মা ঘুমান নাই, শুইয়াই ছিলেন। তিনি উঠিয়া বসিলেন; বলিলেন, "না, অসুখ করে নাই।"

"তবে অমন করে শুয়ে রয়েছ কেন?"

মা বিষণ্ণ মুখে বলিলেন, "শিশিরের একখানা চিঠি পেয়ে মনটা বড় ভাল নেই।"

"দাদার চিঠি! দাদা ভাল আছে ত?"

মা বলিলেন, "ভালই আছে।"

"তবে তুমি ভাবছ কেন? কৈ, চিঠি?"

মা হাত নাড়িয়া ঘরের মধ্যে চিঠি আছে, বুঝাইয়া দিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে যাইয়া দেখিলাম; বিছানার উপর চিঠিখানি পড়িয়া আছে। আমি চিঠিখানি আগাগোড়া পড়িলাম। বি-এ পাশ জ্যেষ্ঠ পুত্র মাতাকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার আদ্যন্ত উদ্ধৃত করিলাম। এমন চিঠি কি না দেখাইলে চলে? চিঠিখানি খুব বড় নয়; কিন্তু তাহাতে যে কয়টী কথা লেখা ছিল, তাহা শক্তিশেল অপেক্ষাও বেশী হৃদয়-বিদারক!

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

মা, শ্রীমান্ বসন্তকে যে পত্র লিখেছি, তাতেই আমার ত্রিশ টাকা বৃত্তি পাইবার সংবাদ পেয়েছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে এর পর থেকে আর টাকার অভাব বোধ করতে হবে না; আমার এম-এ পড়বার খরচ আর বাড়ী থেকে দিতে হবে না। বসন্তকে যে একটু বিশ্রামের অবকাশ দিতে পারলাম, এই ভেবেই আমার আনন্দ হচ্চে। সে এখন ছেলে-পড়ানো ছেড়ে দিলেই পারে; স্কুলে যা বেতন পায়, তাতেই খরচ কুলিয়ে যাবে; আর আমিও এখন থেকে মাসে-মাসে কিছু-কিছু করে পাঠিয়ে দিতে পারব।

তার পর, আর একটা কথা। আপনাদের না জানিয়ে আমি একটা কাজ করে বসেছি। আমি গত শুক্রবারে কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রামকমল ঘোষ মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেছি। যে হরেন্দ্র ছেলেটীর কথা আপনাকে বলেছিলাম, যাদের সঙ্গে আমি মধুপুরে গিয়াছিলাম, সেই হরেন্দ্র রামকমল বাবুর ছেলে। তাঁরা অত্যন্ত জেদ করায় আমি অস্বীকার করতে পারি নাই। হঠাৎ হয়ে গেল জন্য আপনাদিগকে সময়মত সংবাদও দিতে পারি নাই। বিশেষ, বিবাহে আমি একটী পয়সাও লই নাই; সুতরাং এ উপলক্ষে এখানে বাসা ভাড়া করে, সকলকে নিয়ে এসে কিছু করা, আমাদের অবস্থায় সম্ভব হোতো না,—তা করতে গেলে কতকগুলো টাকা ধার

করতে হোত। তাই ভেবেই, কোন কিছু করা সঙ্গত মনে করি নাই। আজ-কাল যে রকম দিন পড়েছে, তাতে হাজার পাশ করলেও, একটা সহায় না থাক্‌লে কিছুই হয় না। রামকমল বাবু বড়লোক, হাইকোর্টে তাঁর খুব পসার; সন্তানের মধ্যে একটী ছেলে আর একটী মেয়ে; এ দিকে সামাজিক হিসাবেও বড় কুলীন। তিনি আমার সহায় হ'লে আমি উন্নতি করতে পারব; তাই এ কাজ করেছি। তিনি আর অপেক্ষা করতে দিলেন না; সেই জন্যই সংবাদও দিতে পারি নাই। এখন আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী বল্‌ছেন যে, আপনি বসন্তকে সঙ্গে করে একবার তাঁদের বাড়ীতে এসে আশীর্ব্বাদ করে যান। বোধ হয় ইহাতে আপনার আপত্তি হবে না। আপনার পত্র পেলে এখান থেকে লোক পাঠাবার বন্দোবস্ত করিব। বসন্ত কখন কলিকাতায় আসে নাই, তাহার সঙ্গে আসা নিরাপদ বলিয়া মনে হয় না। পত্রের উত্তর অতি শীঘ্র দিবেন। নিবেদন ইতি

সেবক

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র।

পত্রখানি পাঠ শেষ করিয়া আমি মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; তিনিও আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন। দেখিলাম, মায়ের চক্ষু দুইটী জলে ভরিয়া গিয়াছে। আমি তখন আর কি করিব,—ছেলেবেলায় যাহা করিতাম, তাহাই

করিলাম,—ছোট ছেলের মত মায়ের কোলের কাছে বসিয়া পড়িলাম। তিনি আমাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার গভীর মনোবেদনা নিবারণের ত আর কোন উপায় পাইলাম না।

একটু পরেই মায়ের কোল হইতে মাথা তুলিয়া বলিলাম, "মা, দাদাকে তুমি ক্ষমা কর। সে যে অন্যায় কাজ করেছে, তা আমি মেনে নিচ্ছি; কিন্তু সে নিজের ও আমাদের ভবিষ্যৎ ভেবেই এ কাজটা করে ফেলেছে; ভাল করে ভাববার অবকাশ পায় নাই। তুমি ত জান মা, দাদা ঐ এক রকমের মানুষ। তার পর, সেদিন বাড়ী এল, আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, দাদা কি একটা কথা বল্‌বে-বল্‌বে করেও বল্‌তে পারে নাই; তাই অত গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। তুমি তার অপরাধ ক্ষমা কর মা।"

মা অতি তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। এমন দৃষ্টি আমি কখন দেখি নাই। মুখের ভাবে একটা কঠোর দৃঢ়তা, একটা অভিমান, একটা অপমানের জ্বালা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। সে ভাব দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। মা অতি কঠোর স্বরে বলিলেন, "বসন্ত, তুমি শিশিরের এই কাজ কি সমর্থন করতে চাও?"

আমি ভয়ে কথা বলিতে পারিলাম না,—এ যে মায়ের সম্পূর্ণ নূতন মূর্ত্তি,—এ মূর্ত্তি ত কখন দেখি নাই!

আমাকে নীরব দেখিয়া মা বলিলেন, "শোন বসন্ত, যে

এমন করে আমাদের অপমান করতে পারে, তার সঙ্গে আমি কোন সম্বন্ধ রাখ্‌তে চাই নে—ছেলে বলে তাকে ক্ষমা করতে পারি না। আমি দরিদ্রা, আমি কুটীরবাসিনী, আমার এ কুটীরে তোমার ভাই-বৌ আসতে পারবে না,—আমি তাই কল্‌কাতায় গিয়ে আশীর্ব্বাদ করে আস্‌ব! আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে শিশির এমন অপমানের কথা আমাকে লিখ্‌তে সাহসী হোলো! সে আমাদের না জানিয়ে বিবাহ করেছে—এই ত এক অপমান! তার পরও যদি সে বৌ নিয়ে বাড়ী আস্‌ত, আমি সে অপমান ভুলে ছেলে-বৌকে কোলে করে নিতাম। তা নয়—আমাকে তার শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তার স্ত্রীকে দেখে আস্‌তে হবে! যে ছেলে মাকে এমন কথা লিখ্‌তে পারে, তাকে তুমি ক্ষমা করতে বল, বসন্ত! তুমি তাকে ক্ষমা কোরো—আমি পারলাম না বাপ! তোমাদের যিনি জন্মদাতা, তিনি আমাকে এ শিক্ষা ত কোন দিন দেন নাই। দারিদ্র্যের গৌরবে, মনুষ্যত্বের মহত্ত্বে তিনি যে হিমালয় পর্ব্বতের মত মাথা উঁচু করে জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ছেলে হয়ে তোমরা অপদার্থ হতে পার, কিন্তু তাঁর সহধর্ম্মিণী তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহত্ত্বের অবমাননা করতে পারবে না।”

ইনিই কি আমাদের মা—আমরা কি এমন মায়ের সন্তান! দাদার ব্যবহারে ত তা’ মনে হয় না। আমার মায়ের

হৃদয় উচ্চ, আমার মা বিদুষী, আমার মা দয়াময়ী, ইহাই ত জানিতাম,—ইহারই পরিচয় ত এতকাল পাইয়াছি; কিন্তু আমার মায়ের হৃদয় যে বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর, আমার মা যে অন্যায় কার্য্য এতদূর ঘৃণা করেন, আমার মা যে দারিদ্র্যের এত গৌরব হৃদয়ে বহন করেন, তাহা জানিবার অবকাশও কোন দিন হয় নাই! আজ মায়ের দৃঢ়তা দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া আমি আমাদের ক্ষুদ্রতা মর্ম্মে-মর্ম্মে অনুভব করিলাম। এমন মায়ের সন্তান হইয়া আমরা এত নীচ, এত স্বার্থপর হইলাম কি করিয়া?

মা আমার মনের কথা বুঝিতে পারিলেন; তিনি বলিলেন, "বাবা বসন্ত, একটী কথা তোমাকে বলি—অন্যায়কে কখনও ক্ষমা করিও না। তার জন্য যদি ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়, সে-ও ভাল। মায়ের এই আদেশ সর্ব্বদা মনে রাখিও; তোমার জীবন সার্থক হইবে, তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আমিও ধন্য হইব।"

আমি সঙ্কোচের সহিত বলিলাম, "তা হ'লে দাদার পত্রের কি উত্তর লেখা যায়?"

মা বলিলেন, "পত্রের উত্তর দিয়েই কাজ নেই।" এই বলিয়াই তিনি যেন একটু অন্যমনস্ক হইলেন। তাহার পরই বলিলেন "না, সে ভাল হবে না; পত্রের উত্তর দিতেই হবে। সে আমার সন্তান—আমার বড় আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র—তাঁর বড় স্নেহের শিশির। তাকে কি আমি অভি-

সম্পাৎ করতে পারি? তা' পারব না—কিন্তু ক্ষমা করতেও পারব না। তাকে আর বৌমাকে আশীর্ব্বাদ করতেই হবে। তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, সে আমাদের কতখানি অপমান করেছে। সে আমাকেই পত্র লিখেছে, আমিই তার জবাব লিখে দেব, তোমার কিছু লিখ্‌তে হবে না।"

আমি বলিলাম, "মা, তুমি যে রকম রাগ করেছ,—হয় ত এমন কথা লিখ্‌বে, যাতে দাদা মনে বড়ই ব্যথা পাবে। তার চাইতে চিঠি না লেখাই ভাল।"

মা বলিলেন, "তোদের কি আমি ব্যথা দিতে পারি? আমি তাকে ব্যথা দেব না। কিন্তু উপদেশ দেওয়া ত আমার কর্ত্তব্য। শিশির যে এমন কাজ করতে পারে, এ কথা আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নাই। বাবা বসন্ত, শিশিরের মুখ যখন মনে পড়ছে—না,—না, তাকে ক্ষমা করতেই পারিনে। কি দুর্ব্বল এই মায়ের হৃদয়!"

(৪)

সেই রাত্রিতেই মায়ের জ্বর হইল। প্রথম রাত্রিতে মনে হইল, সামান্য জ্বর! কিন্তু যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ততই জ্বরও বাড়িতে লাগিল। বাড়ীতে আমি একাকী; কি যে করিব, ভাবিয়া পাইলাম না। শেষে প্রতিবেশী রামধন জ্যেঠামহাশয়কে সংবাদ দিলাম। তিনি তখনই

আসিয়া মায়ের নাড়ী দেখিলেন ; বলিলেন "তাই ত বসন্ত, সন্ধ্যা রাত্রিতে জ্বর এসেছে, আর এখন বোধ হয় রাত্রি একটা কি দুটো,—এখনই নাড়ীর অবস্থা এমন হয়েছে। তা' ভয় নেই বাবা! এখনই কিন্তু ডাক্তার ডাকা উচিত। তুমি চিন্তামণি ডাক্তারের কাছে এখনই যাও ; আর যাবার সময় আমাদের বাড়ীতে বলে যাও, যেন তারা আসে। যাও বাবা, আর দেরী কোরো না, জ্বরটা শক্ত জ্বরই মনে হচ্চে।"

আমি আর বিলম্ব করিলাম না। ডাক্তার বাবুর বাড়ীতে যাওয়ার পথেই রামধন জ্যেঠার বাড়ীতে সংবাদ দিয়া গেলাম।

ডাক্তার চিন্তামণি বাবু আমাকে বড়ই ভালবাসেন ; আমি তাঁর ছেলেকে বাড়ীতে পড়াই। তাঁকে সংবাদ দিবামাত্র তিনি আমার সঙ্গে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, এবং আমার কাছে মায়ের অবস্থার কথা শুনিয়া তিন-চারিটী ঔষধও সঙ্গে লইলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বাড়ী আসিলাম। তখন মা প্রলাপ বকিতেছেন। কথা বেশী নয়, শুধু "শিশির, বাবা—বাড়ী আয়, আমি তোকে আশীর্ব্বাদ করছি।" একটু চুপ করিয়া থাকেন, আবার ঐ কথা। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ঘোর বিকারের অবস্থা। সন্ধ্যার সময় জ্বর হয়েছে, আর এখনই এই অবস্থা! তাই ত!" তিনি সঙ্গে যে ঔষধ আনিয়াছিলেন, তাহারই দুই তিনটা মিশাইয়া

একবার খাওয়াইয়া দিলেন, এবং একটা ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া আমাকে তাঁহার ডিস্‌পেন্‌সারীতে পাঠাইয়া দিলেন; বলিলেন, রোগের অবস্থা ভাল করিয়া না দেখিয়া তিনি বাড়ী যাইবেন না।

কোন রকমে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে আরও সকলে আসিলেন। তখনও প্রলাপ, "ওরে শিশির —শিশির!"

সকলেই দাদাকে তার করিতে বলিলেন। প্রতিবেশী একজন তার করিতে গেলেন। আমি মায়ের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। বেলা যখন এগারটা, তখন মায়ের যেন জ্ঞান-সঞ্চার হইল। তিনি আমার দিকে চাহিয়া অতি ধীর স্বরে বলিলেন, "বসন্ত, শিশির—" আরও যেন কি বলিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কথা বাহির হইল না। আমি বলিলাম, "মা, দাদাকে আস্‌বার জন্য তার করা হয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া মা কেমন যেন হইয়া গেলেন; অতি তীব্র কণ্ঠে বলিলেন, "না, তার এসে কাজ নেই।" এখনও মা দাদাকে ক্ষমা করেন নাই, অথচ বিকারের ঘোরে শুধুই দাদার নাম করিয়াছেন—তাহাকেই ডাকিয়াছেন।

ডাক্তার বাবুর নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি অনতিবিলম্বে আসিয়া পরীক্ষা করিলেন; বলিলেন, "বসন্ত, তোমার মাকে বাঁচাতে পারলাম না। শিশিরের আসা পর্য্যন্ত রাখ্‌তে পারি কি না সন্দেহ।"

ডাক্তার বাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইল। বেলা তিনটার সময় মা একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "শিশির"—তাহার পরই সব শেষ! কি নিদারুণ মনোবেদনা, কি কঠোর অভিমান বুকে করিয়া মা চলিয়া গেলেন, তাহা আমিই বুঝিলাম।

সমস্ত আয়োজন করিতে বিলম্ব হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরই অদূরবর্ত্তী নদীর তীরে শ্মশান-ঘাটে মাকে লইয়া যাওয়া হইল। দাদার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিলাম, কিন্তু পরদিন বেলা আটটার পূর্ব্বে দাদার বাড়ী পৌঁছিবার কোন উপায়ই ছিল না। মৃতদেহ এত অধিক সময় বাড়ীতে রাখা কেহই সঙ্গত মনে করিলেন না। কাজেই দাদার যাহা কার্য্য, সে সকলই আমাকেই করিতে হইল।

বাড়ী ফিরিতে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিয়া গেল। অবশিষ্ট রাত্রিটুকু বসিয়াই কাটাইলাম; প্রতিবেশী তিন-চারিজনও আমাদের বাড়ীতেই থাকিলেন।

বেলা আটটার সময় দাদা আসিল। আমি তখন বাহিরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া ছিলাম—দাদারই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আমাকে দেখিয়াই দাদা দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন, "বসন্ত, মা ?"

আমার তখন কি হইল, বলিতে পারি না। আমি মূর্খ হই, আর যাই হই,—কোন দিন দাদাকে একটীও কড়া কথা বলি নাই। তখন আমি সংযম হারাইলাম; আমি

বলিয়া উঠিলাম, "মা! মাকে দেখ্‌তে এসেছ? তোমার অপমান সইতে না পেরে মা যে তোমারই নাম করতে-করতে চলে গিয়েছেন! তুমিই মাকে হত্যা করেছ—তুমিই করেছ! কাকে দেখ্‌তে এসেছ?"

এ নির্ম্মম আক্রমণ—এ শক্তি-শেলের আঘাত দাদা সহ্য করিতে পারিল না—সেইখানেই বসিয়া পড়িল,—একটী কথাও বলিবার শক্তি তাহার হইল না—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিল না। আমি পাষাণ-মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তখন আমার স্কন্ধে শয়তান চাপিয়াছিল,—তাই আমি এমন হলাহল ঢালিতে পারিয়াছিলাম—তাই আমি আমার দাদার বুকে এমন তীক্ষ্ণ শর বিদ্ধ করিতে পারিয়াছিলাম।

অকস্মাৎ মায়ের মুখ আমার মনে পড়িল—মায়ের কথা আমার মনে পড়িল—মা যে দাদাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছে—মা যে দাদার নাম ছাড়া অন্য-নাম—ভগবানের নাম পর্য্যন্তও করেন নাই! আর আমি এ কি করিলাম! হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া দাদার উপর কি কঠোর ভাষাই প্রয়োগ করিলাম!

তখন আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না,—দুই হাতে দাদার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, "দাদা, ক্ষমা কর—আমাকে ক্ষমা কর ভাই। মা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে গিয়েছেন। মা মাগো!" আমি আর কথা বলিতে পারিলাম না। দাদা আমাকে তাহার বুকের মধ্যে জড়াইয়া

ধরিল। আমার তখন চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইল, 'মা। দাদাকে ক্ষমা কর মা! একবার এসে দাদাকে ক্ষমা করে যাও! একবার এসে ডাক—শিশির!'

*   *   *   *

মায়ের মৃত্যুর পর একুশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে; আমার বয়স এখন চল্লিশ বৎসর। আমি এখন সেই মাষ্টারীই করিতেছি। এখন আর কুড়ি টাকা বেতন পাই না—চল্লিশ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষকের কাজ করি। দাদার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে—তিনি এখন হাইকোর্টের উকীল; ছেলে-মেয়েও হইয়াছে। আমাকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য—বিবাহ দিয়া সংসারী করিবার জন্য দাদা অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। আমি যাই নাই—যাইব না। বিবাহ করি নাই—করিব না। যে কয়দিন বাঁচিয়া থাকিব, মায়ের এই ঘরেই থাকিব,—মায়ের তুলসী-মঞ্চে সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিব—দিনান্তে সেইখানে বসিয়া মায়ের নাম করিব। অন্য দেবতার নাম শিখি নাই—আমার অন্য দেবতা নাই—আমি মার কাছে মন্ত্র পাইয়াছি—"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী";—সেই মন্ত্রই জপ করি। যে দিন মা ডাকিবেন, সেই দিন ঐ মন্ত্র জপ করিতে-করিতে মায়ের ছেলে মায়ের কোলে চলিয়া যাইব। তোমরা বলিতে পার—সে দিন কবে আসিবে?

সমাপ্ত

৮। শাশ্বত-ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ
৯। বড় বাড়ী (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। অরক্ষণীয়া (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ
১৫। লাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
১৬। আলেয়া (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
১৭। বেগম সমরু (সচিত্র)—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮। নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
১৯। বিল্বদল—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
২০। হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
২১। মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
২২। লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায় বি-এল।
২৩। সুখের ঘর (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এম, এ
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।
২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—অধ্যাপক শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।
৩০। নববর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
৩২। হিসাব নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।
৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। ইংরাজী কাব্যকথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম, এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা